কথা-চতুষ্টয়।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
প্রণীত।

কলিকাতা;
১৩/৭নং বৃন্দাবন বসুর লেন, সাহিত্য-যন্ত্রে
শ্রীযজ্ঞেশ্বর ঘোষ কর্ত্তৃক মুদ্রিত
ও
৬নং দ্বারকানাথ ঠাকুরের লেন হইতে
শ্রীকালিদাস চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

১৩০১।

সূচী

কথা-চতুষ্টয়।

মধ্যবর্ত্তিনী।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

নিবারণের সংসার নিতান্তই সচরাচর রকমের, তাহাতে কাব্যরসের কোন নামগন্ধ ছিল না। জীবনে উক্ত রসের যে কোন আবশ্যক আছে এমন কথা তাহার মনে কখনও উদয় হয় নাই। যেমন পরিচিত পুরাতন চটিজোড়াটার মধ্যে পা দুটো দিব্য নিশ্চিন্তভাবে প্রবেশ করে, এই পুরাতন পৃথিবীটার মধ্যে নিবারণ সেইরূপ আপনার চিরাভ্যস্ত স্থানটি অধিকার করিয়া থাকে, সে সম্বন্ধে ভ্রমেও কোনরূপ চিন্তা, তর্ক বা তত্ত্বালোচনা করে না।

নিবারণ প্রাতঃকালে উঠিয়া গলির ধারে গৃহদ্বারে খোলা-গায়ে বসিয়া অত্যন্ত নিরুদ্বিগ্ন ভাবে হুঁকাটি লইয়া তামাক খাইতে থাকে। পথ দিয়া লোকজন যাতায়াত করে, গাড়ি-ঘোড়া চলে, বৈষ্ণব-ভিখারী গান গাহে, পুরাতন বোতল-

সংগ্রহকারী হাঁকিয়া চলিয়া যায়; এই সমস্ত চঞ্চল দৃশ্য মনকে লঘুভাবে ব্যাপৃত রাখে এবং যে দিন কাঁচা আম অথবা তপ্‌সী মাছওয়ালা আসে, সে দিন অনেক দরদাম করিয়া কিঞ্চিৎ বিশেষরূপ রন্ধনের আয়োজন হয়। তাহার পর যথাসময়ে তেল মাখিয়া স্নান করিয়া আহারান্তে দড়িতে ঝুলান চাপকানটি পরিয়া, এক ছিলিম তামাক পানের সহিত নিঃশেষ-পূর্ব্বক আর একটি পান মুখে পূরিয়া, আপিসে যাত্রা করে। আপিস হইতে ফিরিয়া আসিয়া সন্ধ্যাবেলাটা প্রতিবেশী রাম-লোচন ঘোষের বাড়িতে প্রশান্ত গম্ভীরভাবে সন্ধ্যাযাপন করিয়া আহারান্তে রাত্রে শয়নগৃহে স্ত্রী হরসুন্দরীর সহিত সাক্ষাৎ হয়।

সেখানে মিত্রদের ছেলের বিবাহে আইবড়ভাত পাঠান, নবনিযুক্ত ঝির অবাধ্যতা, ছেঁচ্‌কিবিশেষে ফোড়নবিশেষের উপযোগিতা সম্বন্ধে যে সমস্ত সংক্ষিপ্ত সমালোচনা চলে, তাহা এ পর্য্যন্ত কোন কবি ছন্দোবদ্ধ করেন নাই এবং সে জন্য নিবারণের মনে কখনও ক্ষোভের উদয় হয় নাই।

ইতিমধ্যে ফাল্গুনমাসে হরসুন্দরীর সঙ্কট পীড়া উপস্থিত হইল। জ্বর আর কিছুতেই ছাড়িতে চাহে না। ডাক্তার যতই কুইনাইন্ দেয়, বাধাপ্রাপ্ত প্রবল স্রোতের ন্যায় জ্বরও তত ঊর্দ্ধে চড়িতে থাকে। এমন বিশ দিন, বাইশ দিন, চল্লিশ দিন পর্য্যন্ত ব্যাধি চলিল।

নিবারণের আপিস্ বন্ধ; রামলোচনের বৈকালিক সভায় বহুকাল আর সে যায় না; কি যে করে তাহার ঠিক নাই।

একবার শয়ন-গৃহে গিয়া রোগীর অবস্থা জানিয়া আসে, একবার বাহিরের বারান্দায় বসিয়া চিন্তিত মুখে তামাক টানিতে থাকে। দুই বেলা ডাক্তার বৈদ্য পরিবর্ত্তন করে এবং যে যাহা বলে সেই ঔষধ পরীক্ষা করিয়া দেখিতে চাহে।

ভালবাসার এইরূপ অব্যবস্থিত শুশ্রূষা সত্ত্বেও চল্লিশ দিনে হরসুন্দরী ব্যাধিমুক্ত হইল। কিন্তু এমনি দুর্ব্বল এবং শীর্ণ হইয়া গেল যে, শরীরটি যেন বহুদূর হইতে অতি ক্ষীণস্বরে "আছি" বলিয়া সাড়া দিতেছে মাত্র।

তখন বসন্তকালে দক্ষিণের হাওয়া দিতে আরম্ভ করিয়াছে এবং উষ্ণ নিশীথের চন্দ্রালোকও সীমন্তিনীদের উন্মুক্ত শয়নকক্ষে নিঃশব্দপদসঞ্চারে প্রবেশাধিকার লাভ করিয়াছে।

হরসুন্দরীর ঘরের নীচেই প্রতিবেশীদের খিড়কীর বাগান। সেটা যে বিশেষ কিছু সুদৃশ্য রমণীয় স্থান তাহা বলিতে পারি না। এক সময় কে একজন সক করিয়া গোটাকতক ক্রোটোন রোপণ করিয়াছিল, তার পরে আর সে দিকে বড় একটা দৃক্‌পাত করে নাই। শুষ্ক ডালের মাচার উপর কুষ্মাণ্ডলতা উঠিয়াছে; বৃদ্ধ কুলগাছের তলায় বিষম জঙ্গল; রান্নাঘরের পাশে প্রাচীর ভাঙ্গিয়া কতকগুলো ইট জড় হইয়া আছে এবং তাহারই সহিত দগ্ধাবশিষ্ট পাথুরে কয়লা এবং ছাই দিন দিন রাশীকৃত হইয়া উঠিতেছে।

কিন্তু বাতায়নতলে শয়ন করিয়া এই বাগানের দিকে চাহিয়া হরসুন্দরী প্রতিমুহূর্ত্তে যে একটি আনন্দরস পান

করিতে লাগিল, তাহার অকিঞ্চিৎকর জীবনে এমন সে আর কখনো করে নাই। গ্রীষ্মকালে স্রোতোবেগ মন্দ হইয়া ক্ষুদ্র গ্রাম্যনদীটি যখন বালুশয্যার উপরে শীর্ণ হইয়া আসে, তখন সে যেমন অত্যন্ত স্বচ্ছতা লাভ করে; তখন যেমন প্রভাতের সূর্য্যালোক তাহার তলদেশে পর্য্যন্ত কম্পিত হইতে থাকে, বায়ু-স্পর্শ তাহার সর্ব্বাঙ্গ পুলকিত করিয়া তোলে, এবং আকাশের তারা তাহার স্ফটিক দর্পণের উপর সুখস্মৃতির ন্যায় অতি সুস্পষ্টভাবে প্রতিবিম্বিত হয়, তেমনি হরসুন্দরীর ক্ষীণ জীবন-তন্তুর উপর আনন্দময়ী প্রকৃতির প্রত্যেক অঙ্গুলি যেন স্পর্শ করিতে লাগিল এবং অন্তরের মধ্যে যে একটি সঙ্গীত উঠিতে লাগিল তাহার ঠিক ভাবটি সে সম্পূর্ণ বুঝিতে পারিল না।

এমন সময় তাহার স্বামী যখন পাশে বসিয়া জিজ্ঞাসা করিত, "কেমন আছ" তখন তাহার চোখে যেন জল উছ-লিয়া উঠিত। রোগশীর্ণ মুখে তাহার চোখ দুটি অত্যন্ত বড় দেখায়, সেই বড় বড় প্রেমার্দ্র সকৃতজ্ঞ চোখ স্বামীর মুখের দিকে তুলিয়া শীর্ণহস্তে স্বামীর হস্ত ধরিয়া চুপ করিয়া পড়িয়া থাকিত, স্বামীর অন্তরেও যেন কোথা হইতে একটা নূতন অপরিচিত আনন্দরশ্মি প্রবেশ লাভ করিত।

এই ভাবে কিছু দিন যায়। একদিন রাত্রে ভাঙ্গা-প্রাচীরের উপরিবর্ত্তী খর্ব্ব অশথগাছের কম্পমান শাখান্তরাল হইতে একখানি বৃহৎ চাঁদ উঠিতেছে এবং সন্ধ্যাবেলাকার গুমট ভাঙ্গিয়া হঠাৎ একটা নিশাচর বাতাস জাগ্রত হইয়া উঠি-

য়াছে, এমন সময় নিবারণের চুলের মধ্যে অঙ্গুলি বুলাইতে বুলাইতে হরসুন্দরী কহিল, "আমাদের ত ছেলেপুলে কিছুই হইল না, তুমি আর একটি বিবাহ কর!"

হরসুন্দরী কিছুদিন হইতে এই কথা ভাবিতেছিল। মনে যখন একটা প্রবল আনন্দ, একটা বৃহৎ প্রেমের সঞ্চার হয়, তখন মানুষ মনে করে আমি সব করিতে পারি। তখন হঠাৎ একটা আত্মবিসর্জ্জনের ইচ্ছা বলবতী হইয়া উঠে। স্রোতের উচ্ছ্বাস যেমন কঠিন তটের উপর আপনাকে সবেগে মূর্চ্ছিত করে, তেমনি প্রেমের আবেগ, আনন্দের উচ্ছ্বাস একটা মহৎ ত্যাগ, একটা বৃহৎ দুঃখের উপর আপনাকে যেন নিক্ষেপ করিতে চাহে।

সেইরূপ অবস্থায় অত্যন্ত পুলকিত চিত্তে একদিন হরসুন্দরী স্থির করিলেন, আমার স্বামীর জন্য আমি খুব বড় একটা কিছু করিব। কিন্তু হায়, যতখানি সাধ ততখানি সাধ্য কাহার আছে। হাতের কাছে কি আছে, কি দেওয়া যায়! ঐশ্বর্য্য নাই, বুদ্ধি নাই, ক্ষমতা নাই, শুধু একটা প্রাণ আছে, সেটাও যদি কোথাও দিবার থাকে এখনি দিয়া ফেলি, কিন্তু তাহারই বা মূল্য কি?

আর স্বামীকে যদি দুগ্ধফেনের মত শুভ্র, নবনীর মত কোমল, শিশুকন্দর্পের মত সুন্দর একটি স্নেহের পুত্তলি সন্তান দিতে পারিতাম! কিন্তু প্রাণপণে ইচ্ছা করিয়া মরিয়া গেলেও ত সে হইবে না। তখন মনে হইল, স্বামীর একটি

বিবাহ দিতে হইবে। ভাবিল, স্ত্রীরা ইহাতে এত কাতর হয় কেন, এ কাজ ত কিছুই কঠিন নহে! স্বামীকে যে ভালবাসে, সপত্নীকে ভালবাসা তাহার পক্ষে কি এমন অসাধ্য! মনে করিয়া বক্ষ স্ফীত হইয়া উঠিল।

প্রস্তাবটা প্রথম যখন শুনিল, নিবারণ হাসিয়া উড়াইয়া দিল, দ্বিতীয় এবং তৃতীয়বারও কর্ণপাত করিল না। স্বামীর এই অসম্মতি, এই অনিচ্ছা দেখিয়া হরসুন্দরীর বিশ্বাস এবং সুখ যতই বাড়িয়া উঠিল তাহার প্রতিজ্ঞাও ততই দৃঢ় হইতে লাগিল।

এ দিকে নিবারণ যত বারম্বার এই অনুরোধ শুনিল, ততই ইহার অসম্ভাব্যতা তাহার মন হইতে দূর হইল, এবং গৃহদ্বারে বসিয়া তামাক খাইতে খাইতে সন্তানপরিবৃত গৃহের সুখময় চিত্র তাহার মনে উজ্জ্বল হইয়া উঠিতে লাগিল।

একদিন নিজেই প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া কহিল, "বুড়া-বয়সে একটি কচি খুকিকে বিবাহ করিয়া আমি মানুষ করিতে পারিব না!"

হরসুন্দরী কহিল, "সে জন্য তোমাকে ভাবিতে হইবে না। মানুষ করিবার ভার আমার উপর রহিল।" বলিতে বলিতে এই সন্তানহীনা রমণীর মনে একটি কিশোরবয়স্কা, সুকুমারী, লজ্জাশীলা, মাতৃক্রোড় হইতে সদ্যোবিচ্যুতা নববধূর মুখচ্ছবি উদয় হইল এবং হৃদয় স্নেহে বিগলিত হইয়া গেল।

নিবারণ কহিল, "আমার আপিস আছে, কাজ আছে,

তুমি আছ, কচি মেয়ের আবদার শুনিবার অবসর আমি পাইব না।"

হরসুন্দরী বারবার করিয়া কহিল তাহার জন্য কিছুমাত্র সময় নষ্ট করিতে হইবে না এবং অবশেষে পরিহাস করিয়া কহিল—"আচ্ছা গো, তখন দেখিব কোথায় বা তোমার কাজ থাকে, কোথায় বা আমি থাকি, আর কোথায় বা তুমি থাক!"

নিবারণ সে কথার উত্তরমাত্র দেওয়া আবশ্যক বোধ করিল না, শাস্তির স্বরূপ হরসুন্দরীর কপোলে হাসিয়া তর্জ্জনী আঘাত করিল। এই ত গেল ভূমিকা।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

একটি নলকপরা অশ্রুভরা ছোটখাটো মেয়ের সহিত নিবারণের বিবাহ হইল, তাহার নাম শৈলবালা।

নিবারণ ভাবিল, নামটি বড় মিষ্ট এবং মুখখানিও বেশ ঢলঢল। তাহার ভাবখানা, তাহার চেহারাখানি, তাহার চলাফেরা একটু বিশেষ মনোযোগ করিয়া চাহিয়া দেখিতে ইচ্ছা করে, কিন্তু সে আর কিছুতেই হইয়া উঠে না। উল্টিয়া এমন ভাব দেখাইতে হয় যে, ঐত একফোঁটা মেয়ে, উহাকে লইয়া ত বিষম বিপদে পড়িলাম, কোনমতে পাশ কাটাইয়া আমার

বয়সোচিত কর্ত্তব্যক্ষেত্রের মধ্যে গিয়া পড়িলে যেন পরিত্রাণ পাওয়া যায়।

হরসুন্দরী নিবারণের এই বিষম বিপদ্‌গ্রস্ত ভাব দেখিয়া মনে মনে বড় আমোদ বোধ করিত। এক এক দিন হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিত, "আহা, পালাও কোথায়! ঐটুকু মেয়ে, ওত আর তোমাকে খাইয়া ফেলিবে না।"—

নিবারণ দ্বিগুণ শশব্যস্ত ভাব ধারণ করিয়া বলিত, "আরে রোস রোস, আমার একটু বিশেষ কাজ আছে।"—বলিয়া যেন পালাইবার পথ পাইত না। হরসুন্দরী হাসিয়া দ্বার আটক করিয়া বলিত, আজ ফাঁকি দিতে পারিবে না। অবশেষে নিবারণ নিতান্তই নিরুপায় হইয়া কাতরভাবে বসিয়া পড়িত।

হরসুন্দরী তাহার কানের কাছে বলিত, "আহা, পরের মেয়েকে ঘরে আনিয়া অমন হতশ্রদ্ধা করিতে নাই।"

এই বলিয়া শৈলবালাকে ধরিয়া নিবারণের বাম পাশে বসাইয়া দিত, এবং জোর করিয়া ঘোমটা খুলিয়া ও চিবুক ধরিয়া, তাহার আনতমুখ তুলিয়া নিবারণকে বলিত, "আহা কেমন চাঁদের মত মুখখানি দেখ দেখি!"—

কোন দিন বা উভয়কে ঘরে বসাইয়া কাজ আছে বলিয়া উঠিয়া যাইত এবং বাহির হইতে ঝনাৎ করিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিত। নিবারণ নিশ্চয় জানিত দু'টি কৌতূহলী চক্ষু কোন-না-কোন ছিদ্রে সংলগ্ন হইয়া আছে—অতিশয় উদাসীনভাবে পাশ ফিরিয়া নিদ্রার উপক্রম করিত, শৈলবালা

ঘোমটা টানিয়া গুটিসুটি মারিয়া মুখ ফিরাইয়া একটা কোণের মধ্যে মিলাইয়া থাকিত।

অবশেষে হরসুন্দরী নিতান্ত না পারিয়া হাল ছাড়িয়া দিল, কিন্তু খুব বেশি দুঃখিত হইল না।

হরসুন্দরী যখন হাল ছাড়িল, তখন স্বয়ং নিবারণ হাল ধরিল। এ বড় কৌতূহল, এ বড় রহস্য! একটুক্‌রা হীরক পাইলে তাহাকে নানাভাবে নানাদিকে ফিরাইয়া দেখিতে ইচ্ছা করে, আর এ একটি ক্ষুদ্র সুন্দর মানুষের মন—বড় অপূর্ব্ব! ইহাকে কত রকম করিয়া স্পর্শ করিয়া, সোহাগ করিয়া, অন্তরাল হইতে, সম্মুখ হইতে, পার্শ্ব হইতে দেখিতে হয়! কখন একবার কানের দুলে দোল দিয়া, কখনো ঘোমটা একটুখানি টানিয়া তুলিয়া, কখনো বিদ্যুতের মত সহসা সচকিতে, কখনো নক্ষত্রের মত দীর্ঘকাল একদৃষ্টে নবনব সৌন্দর্য্যের সীমা আবিষ্কার করিতে হয়।

ম্যাক্‌মোরান্ কোম্পানির আপিসের হেডবাবু শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্রের অদৃষ্টে এমন অভিজ্ঞতা ইতিপূর্ব্বে হয় নাই। সে যখন প্রথম বিবাহ করিয়াছিল তখন বালক ছিল, যখন যৌবন লাভ করিল তখন স্ত্রী তাহার নিকট চিরপরিচিত, বিবাহিত জীবন চিরাভ্যস্ত। হরসুন্দরীকে অবশ্যই সে ভাল বাসিত, কিন্তু কখনই তাহার মনে ক্রমে ক্রমে প্রেমের সচেতন সঞ্চার হয় নাই।

একেবারে পাকা আম্রের মধ্যেই যে পতঙ্গ জন্মলাভ করি-

য়াছে, যাহাকে কোন কালে রস অন্বেষণ করিতে হয় নাই, অল্পে অল্পে রসাস্বাদ করিতে হয় নাই, তাহাকে একবার বসন্ত কালের বিকশিত পুষ্পবনের মধ্যে ছাড়িয়া দেওয়া হোক্ দেখি—বিকচোন্মুখ গোলাপের আধখোলা মুখটির কাছে ঘুরিয়া ঘুরিয়া তাহার কি আগ্রহ! একটুকু যে সৌরভ পায়, একটুকু যে মধুর আস্বাদ লাভ করে তাহাতে তাহার কি নেশা!

নিবারণ প্রথমটা কখন বা একটা গাউন্‌পরা কাঁচের পুতুল, কখনো বা এক শিশি এসেন্স, কখনো বা কিছু মিষ্টদ্রব্য কিনিয়া আনিয়া শৈলবালাকে গোপনে দিয়া যাইত। এমনি করিয়া একটু খানি ঘনিষ্ঠতার সূত্রপাত হয়। অবশেষে কখন্ একদিন হরসুন্দরী গৃহকার্য্যের অবকাশে আসিয়া দ্বারের ছিদ্র দিয়া দেখিল, নিবারণ এবং শৈলবালা বসিয়া কড়ি লইয়া দশ পঁচিশ খেলিতেছে।

বুড়া বয়সের এই খেলা বটে! নিবারণ সকালে আহারাদি করিয়া যেন আপিসে বাহির হইল কিন্তু আপিসে না গিয়া কখন্ অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়াছে! এ প্রবঞ্চনার কি আবশ্যক ছিল! হঠাৎ একটা জ্বলন্ত বজ্রশলাকা দিয়া কে যেন হরসুন্দরীর চোক খুলিয়া দিল, সেই তীব্রতাপে চোকের জল বাষ্প হইয়া শুকাইয়া গেল!

হরসুন্দরী মনে মনে কহিল, আমিই ত উহাকে ঘরে আনিলাম, আমিই ত মিলন করাইয়া দিলাম, তবে আমার সঙ্গে এমন ব্যবহার কেন, যেন আমি উঁহাদের সুখের কাঁটা।

হরসুন্দরী শৈলবালাকে গৃহকার্য্য শিখাইত। একদিন নিবারণ মুখ ফুটিয়া বলিল, "ছেলেমানুষ, উহাকে তুমি বড় বেশি পরিশ্রম করাইতেছ, উহার শরীর তেমন সবল নহে।"

বড় একটা তীব্র উত্তর হরসুন্দরীর মুখের কাছে আসিয়াছিল, কিন্তু কিছু বলিল না, চুপ করিয়া গেল।

সেই অবধি বউকে কোন গৃহকার্য্যে হাত দিতে দিত না। রাঁধাবাড়া, দেখাশুনা সমস্ত কাজ নিজে করিত। এমন হইল, শৈলবালা আর নড়িয়া বসিতে পারে না, হরসুন্দরী দাসীর মত তাহার সেবা করে এবং স্বামী বিদূষকের মত তাহার মনোরঞ্জন করে। সংসারের কাজ করা, পরের দিকে তাকানো যে, জীবনের কর্ত্তব্য এ শিক্ষাই তাহার হইল না।

হরসুন্দরী যে নীরবে দাসীর মত কাজ করিতে লাগিল তাহার মধ্যে ভারি একটা গর্ব্ব আছে। তাহার মধ্যে ন্যূনতা এবং দীনতা নাই। সে কহিল, তোমরা দুই শিশুতে মিলিয়া খেলা কর সংসারের সমস্ত ভার আমি লইলাম!

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

হায়, আজ কোথায় সে বল, যে বলে হরসুন্দরী মনে করিয়াছিল স্বামীর জন্য চিরজীবনকাল সে আপনার প্রেমের দাবীর অর্দ্ধেক অংশ অকাতরে ছাড়িয়া দিতে পারিবে। হঠাৎ এক দিন পূর্ণিমার রাত্রে জীবনে যখন জোয়ার আসে, তখন দুই

কূল প্লাবিত করিয়া মানুষ মনে করে, আমার কোথাও সীমা নাই। তখন যে একটা বৃহৎ প্রতিজ্ঞা করিয়া বসে, জীবনের সুদীর্ঘ ভাঁটার সময় সে প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে তাহার সমস্ত প্রাণে টান পড়ে। হঠাৎ ঐশ্বর্য্যের দিনে লেখনীর এক আঁচড়ে যে দানপত্র লিখিয়া দেয়, চির-দারিদ্র্যের দিনে পলে পলে তিল তিল করিয়া তাহা শোধ করিতে হয়। তখন বুঝা যায়, মানুষ বড় দীন, হৃদয় বড় দুর্ব্বল, তাহার ক্ষমতা অতি যৎসামান্য!

দীর্ঘ রোগাবসানে ক্ষীণ, রক্তহীন, পাণ্ডু কলেবরে হরসুন্দরী সে দিন শুক্ল দ্বিতীয়ার চাঁদের মত একটি শীর্ণ রেখামাত্র ছিল; সংসারে নিতান্ত লঘু হইয়া ভাসিতেছিল। মনে হইয়াছিল, আমার যেন কিছুই না হইলেও চলে। ক্রমে শরীর বলী হইয়া উঠিল, রক্তের তেজ বাড়িতে লাগিল, তখন হরসুন্দরীর মনে কোথা হইতে এক দল শরীক আসিয়া উপস্থিত হইল, তাহারা উচ্চৈঃস্বরে কহিল, তুমি ত ত্যাগপত্র লিখিয়া বসিয়া আছ, কিন্তু আমাদের দাবী আমরা ছাড়িব না।

হরসুন্দরী যেদিন প্রথম পরিষ্কাররূপে আপন অবস্থা বুঝিতে পারিল, সেদিন নিবারণ ও শৈলবালাকে আপন শয়নগৃহ ছাড়িয়া দিয়া ভিন্ন গৃহে একাকিনী গিয়া শয়ন করিল।

আট বৎসর বয়সে বাসররাত্রে যে শয্যায় প্রথম শয়ন করিয়াছিল আজ সাতাশ বৎসর পরে সেই শয্যা ত্যাগ করিল। প্রদীপ নিবাইয়া দিয়া এই সধবা রমণী যখন অসহ

হৃদয়ভার লইয়া তাহার নূতন বৈধব্যশয্যার উপরে আসিয়া পড়িল, তখন গলির অপর প্রান্তে একজন সৌখীন যুবা বেহাগ রাগিণীতে মালিনীর গান গাহিতেছিল; আর একজন বাঁয়া তব্‌লায় সঙ্গৎ করিতেছিল এবং শ্রোতৃবন্ধুগণ সমের কাছে হা-হাঃ করিয়া চীৎকার করিয়া উঠিতেছিল।

তাহার সেই গান সেই নিস্তব্ধ জ্যোৎস্না-রাত্রে পার্শ্বের ঘরে মন্দ শুনাইতেছিল না। তখন বালিকা শৈলবালার ঘুমে চোখ ঢুলিয়া পড়িতেছিল, আর নিবারণ তাহার কানের কাছে মুখ রাখিয়া ধীরে ধীরে ডাকিতেছিল, সই!

লোকটা ইতিমধ্যে বঙ্কিম বাবুর চন্দ্রশেখর পড়িয়া ফেলিয়াছে এবং দুই একজন আধুনিক কবির কাব্যও শৈলবালাকে পড়িয়া শুনাইয়াছে।

নিবারণের জীবনের নিম্নস্তরে যে একটি যৌবন-উৎস বরাবর চাপা পড়িয়াছিল, আঘাত পাইয়া হঠাৎ বড় অসময়ে তাহা উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। কেহই সেজন্য প্রস্তুত ছিল না, এই হেতু অকস্মাৎ তাহার বুদ্ধিশুদ্ধি এবং সংসারের সমস্ত বন্দোবস্ত উল্টাপাল্টা হইয়া গেল। সে বেচারা কোন কালে জানিত না, মানুষের ভিতরে এমন সকল উপদ্রবজনক পদার্থ থাকে, এমন সকল দুর্দ্দাম দুরন্ত শক্তি, যাহা সমস্ত হিসাব কিতাব, শৃঙ্খলা সামঞ্জস্য একেবারে নয়ছয় করিয়া দেয়।

কেবল নিবারণ নহে, হরসুন্দরীও একটা নূতন বেদনার পরিচয় পাইল। এ কিসের আকাঙ্ক্ষা, এ কিসের দুঃসহ যন্ত্রণা!

মন এখন যাহা চায়, কখনও ত তাহা চাহেও নাই, কখনও ত তাহা পায়ও নাই। যখন ভদ্রভাবে নিবারণ নিয়মিত আপিসে যাইত, যখন নিদ্রার পূর্ব্বে কিয়ৎকালের জন্য গয়লার হিসাব, দ্রব্যের মহার্ঘতা এবং লৌকিকতার কর্ত্তব্য সম্বন্ধে আলোচনা চলিত, তখন ত এই অন্তর্বিপ্লবের কোন সূত্রপাতমাত্র ছিল না। ভালবাসিত বটে, কিন্তু তাহার ত কোন উজ্জ্বলতা, কোন উত্তাপ ছিল না। সে ভালবাসা অপ্রজ্জ্বলিত ইন্ধনের মত ছিল মাত্র।

আজ তাহার মনে হইল, জীবনের সফলতা হইতে যেন চিরকাল কে তাহাকে বঞ্চিত করিয়া আসিয়াছে। তাহার হৃদয় যেন চিরদিন উপবাসী হইয়া আছে। তাহার এই নারী-জীবন বড় দারিদ্র্যেই কাটিয়াছে। সে কেবল হাটবাজার পানমস্‌লা তরিতরকারীর ঝঞ্ঝাট লইয়াই সাতাশটা অমূল্য বৎসর দাসীবৃত্তি করিয়া কাটাইল, আর আজ জীবনের মধ্য-পথে আসিয়া দেখিল, তাহারই শয়নকক্ষের পার্শ্বে এক গোপন মহামহৈশ্বর্য্য ভাণ্ডারের কুলুপ খুলিয়া একটি ক্ষুদ্র বালিকা একেবারে রাজরাজেশ্বরী হইয়া বসিল। নারী দাসী বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে নারী রাণীও বটে। কিন্তু ভাগাভাগী করিয়া একজন নারী হইল দাসী, আর একজন নারী হইল রাণী; তাহাতে দাসীর গৌরব গেল, রাণীর সুখ রহিল না।

কারণ, শৈলবালাও নারী-জীবনের যথার্থ সুখের স্বাদ পাইল না। এত অবিশ্রাম আদর পাইল যে, ভালবাসিবার

আর মুহূর্ত্ত অবসর রহিল না। সমুদ্রের দিকে প্রবাহিত হইয়া, সমুদ্রের মধ্যে আত্মবিসর্জ্জন করিয়া বোধ করি নদীর একটি মহৎ চরিতার্থতা আছে, কিন্তু সমুদ্র যদি জোয়ারের টানে আকৃষ্ট হইয়া ক্রমাগতই নদীর উন্মুখীন হইয়া রহে, তবে নদী কেবল নিজের মধ্যেই নিজে স্ফীত হইতে থাকে। সংসার তাহার সমস্ত আদর সোহাগ লইয়া দিবারাত্রি শৈলবালার দিকে অগ্রসর হইয়া রহিল, তাহাতে শৈলবালার আত্মাদর অতিশয় উত্তুঙ্গ হইয়া উঠিতে লাগিল, সংসারের প্রতি তাহার ভালবাসা পড়িতে পাইল না। সে জানিল, আমার জন্যই সমস্ত, এবং আমি কাহার জন্যও নহি। এ অবস্থায় যথেষ্ট অহঙ্কার আছে কিন্তু পরিতৃপ্তি কিছুই নাই।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

একদিন ঘনঘোর মেঘ করিয়া বর্ষা আসিয়াছে। এমনি অন্ধকার করিয়াছে যে,: ঘরের মধ্যে কাজকর্ম্ম করা অসাধ্য। বাহিরে ঝুপ্‌ঝুপ্‌ করিয়া বৃষ্টি হইতেছে। কুলগাছের তলায় লতাগুল্মের জঙ্গল প্রায় নিমগ্ন হইয়া গিয়াছে এবং প্রাচীরের পার্শ্ববর্ত্তী নালা দিয়া ঘোলা জলস্রোত কল্‌কল্‌ শব্দে বহিয়া চলিয়াছে। হরসুন্দরী আপনার নূতন শয়ন-গৃহের নির্জ্জন অন্ধকারে জান্‌লার কাছে চুপ করিয়া বসিয়া আছে।

এমন সময় নিবারণ চোরের মত ধীরে ধীরে দ্বারের কাছে প্রবেশ করিল, ফিরিয়া যাইবে কি অগ্রসর হইবে ভাবিয়া পাইল না। হরসুন্দরী তাহা লক্ষ্য করিল কিন্তু একটি কথাও কহিল না।

তখন নিবারণ হঠাৎ একেবারে তীরের মত হরসুন্দরীর পার্শ্বে গিয়া এক নিশ্বাসে বলিয়া ফেলিল—গোটাকতক গহনার আবশ্যক হইয়াছে। জান ত অনেকগুলো দেনা হইয়া পড়িয়াছে, দেন্‌দার বড়ই অপমান করিতেছে—কিছু বন্ধক রাখিতে হইবে—শীঘ্রই ছাড়াইয়া লইতে পারিব।

হরসুন্দরী কোন উত্তর দিল না, নিবারণ চোরের মত দাঁড়াইয়া রহিল। অবশেষে পুনশ্চ কহিল, তবে আজ কি হইবে না?—

হরসুন্দরী কহিল—"না।"

ঘরে প্রবেশ করাও যেমন শক্ত, ঘর হইতে অবিলম্বে বাহির হওয়াও তেমনি কঠিন। নিবারণ একটু এদিকে ওদিকে চাহিয়া ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, "তবে অন্যত্র চেষ্টা দেখিগে যাই"—বলিয়া প্রস্থান করিল।

ঋণ কোথায় এবং কোথায় গহনা বন্ধক দিতে হইবে হরসুন্দরী তাহা সমস্তই বুঝিল। বুঝিল নববধূ পূর্ব্বরাত্রে তাহার এই হতবুদ্ধি পোষা পুরুষটিকে অত্যন্ত ঝঙ্কার দিয়া বলিয়াছিল, "দিদির সিন্ধুকভরা গহনা, আর আমি বুঝি একখানি পরিতে পাই না?"

নিবারণ চলিয়া গেলে ধীরে ধীরে উঠিয়া লোহার সিন্ধুক

খুলিয়া একে একে সমস্ত গহনা বাহির করিল। শৈলবালাকে ডাকিয়া প্রথমে আপনার বিবাহের বেণারসী সাড়িখানি পরাইল, তাহার পর তাহার আপাদমস্তক এক একখানি করিয়া গহনায় ভরিয়া দিল। ভাল করিয়া চুল বাঁধিয়া দিয়া প্রদীপ জ্বালিয়া দেখিল বালিকার মুখখানি বড় সুমিষ্ট, একটি সদ্যঃপক্ক সুগন্ধ ফলের মত নিটোল, রসপূর্ণ। শৈলবালা যখন ঝম্‌ঝম্ শব্দ করিয়া চলিয়া গেল, সেই শব্দ বহুক্ষণ ধরিয়া হরসুন্দরীর শিরার রক্তের মধ্যে ঝিম্‌ঝিম্ করিয়া বাজিতে লাগিল। মনে মনে কহিল, আজ আর কি লইয়া তোতে আমাতে তুলনা হইবে? কিন্তু এক সময়ে আমারও ত ঐ বয়স ছিল, আমিও ত অম্‌নি যৌবনের শেষরেখা পর্য্যন্ত ভরিয়া উঠিয়াছিলাম; তবে আমাকে সে কথা কেহ জানায় নি কেন? কখন্ সে দিন আসিল এবং কখন্ সে দিন গেল তাহা একবার সংবাদও পাইলাম না! কিন্তু কি গর্ব্বে, কি গৌরবে, কি তরঙ্গ তুলিয়াই শৈলবালা চলিয়াছে।

হরসুন্দরী যখন কেবলমাত্র ঘরকন্নাই জানিত তখন এই গহনাগুলি তাহার কাছে কত দামী ছিল! তখন কি নির্ব্বোধের মত এ সমস্ত এমন করিয়া এক মুহূর্ত্তে হাতছাড়া করিতে পারিত? এখন ঘরকন্না ছাড়া আর একটা বড় কিসের পরিচয় পাইয়াছে, এখন গহনার দাম, ভবিষ্যতের হিসাব সমস্ত তুচ্ছ হইয়া গিয়াছে।

আর শৈলবালা সোণামাণিক ঝক্‌মক্ করিয়া শয়নগৃহে

চলিয়া গেল, একবার মুহূর্ত্তের তরে ভাবিলও না হরসুন্দরী তাহাকে কতখানি দিল। সে জানিল চতুর্দ্দিক হইতে সমস্ত সেবা, সমস্ত সম্পদ, সমস্ত সৌভাগ্য স্বাভাবিক নিয়মে তাহার মধ্যে আসিয়া পরিসমাপ্ত হইবে, কারণ, সে হইল শৈলবালা, সে হইল সই!

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

এক এক জন লোক স্বপ্নাবস্থায় নির্ভীক ভাবে অত্যন্ত সঙ্কটের পথ দিয়া চলিয়া যায়, মুহূর্ত্তমাত্র চিন্তা করে না। অনেক জাগ্রত মানুষেরও তেমনি চির-স্বপ্নাবস্থা উপস্থিত হয়, কিছুমাত্র জ্ঞান থাকে না, বিপদের সঙ্কীর্ণ পথ দিয়া নিশ্চিন্ত মনে অগ্রসর হইতে থাকে, অবশেষে নিদারুণ সর্ব্বনাশের মধ্যে গিয়া জাগ্রত হইয়া উঠে!

আমাদের ম্যাক্‌মোরান্ কোম্পানির হেড্ বাবুটিরও সেই দশা। শৈলবালা তাহার জীবনের মাঝখানে একটা প্রবল আবর্ত্তের মত ঘুরিতে লাগিল, এবং বহুদূর হইতে বিবিধ মহার্ঘ পদার্থ আকৃষ্ট হইয়া তাহার মধ্যে বিলুপ্ত হইতে লাগিল। কেবল যে নিবারণের মনুষ্যত্ব এবং মাসিক বেতন, হরসুন্দরীর সুখসৌভাগ্য এবং বসনভূষণ, তাহা নহে; সঙ্গে সঙ্গে ম্যাক্‌মোরান্ কোম্পানির ক্যাশ তহবিলেও গোপনে টান পড়িল।

তাহার মধ্য হইতেও দুটা একটা করিয়া তোড়া অদৃশ্য হইতে লাগিল। নিবারণ স্থির করিত আগামী মাসের বেতন হইতে আস্তে আস্তে শোধ করিয়া রাখিব। কিন্তু আগামী মাসের বেতনটি হাতে আসিবামাত্র সেই আবর্ত্ত হইতে টান পড়ে এবং শেষে দুআনীটি পর্য্যন্ত চকিতের মত চিক্‌মিক্ করিয়া বিদ্যুৎ-বেগে অন্তর্হিত হয়।

শেষে একদিন ধরা পড়িল। পুরুষানুক্রমের চাকুরি; সাহেব বড় ভালবাসে; তহবিল পূরণ করিয়া দিবার জন্য দুইদিনমাত্র সময় দিল।

কেমন করিয়া যে ক্রমে ক্রমে আড়াই হাজার টাকার তহবিল ভাঙ্গিয়াছে তাহা নিবারণ নিজেই বুঝিতে পারিল না। একেবারে পাগলের মত হইয়া হরসুন্দরীর কাছে গেল, বলিল, "সর্ব্বনাশ হইয়াছে!"

হরসুন্দরী সমস্ত শুনিয়া একেবারে পাংশুবর্ণ হইয়া গেল!

নিবারণ কহিল, "শীঘ্র গহনাগুলা বাহির কর।" হরসুন্দরী কহিল, "সে ত আমি সমস্তই ছোটবৌকে দিয়াছি!"

নিবারণ নিতান্ত শিশুর মত অধীর হইয়া বলিতে লাগিল, "কেন দিলে ছোটবৌকে? কেন দিলে? কে তোমাকে দিতে বলিল?"

হরসুন্দরী তাহার প্রকৃত উত্তর না দিয়া কহিল, "তাহাতে ক্ষতি কি হইয়াছে? সে ত আর জলে পড়ে নাই?"

ভীরু নিবারণ কাতর স্বরে কহিল, "তবে যদি তুমি কোন

ছুতা করিয়া তাঁহার কাছ হইতে বাহির করিতে পার! কিন্তু আমার মাথা খাও বলিয়ো না যে, আমি চাহিতেছি, কিম্বা কি জন্য চাহিতেছি!"

তখন হরসুন্দরী মর্ম্মান্তিক বিরক্তি ও ঘৃণাভরে বলিয়া উঠিল, "এই কি তোমার ছল ছুতা করিবার সোহাগ দেখাইবার সময়! চল!" বলিয়া স্বামীকে লইয়া ছোট-বৌয়ের ঘরে প্রবেশ করিল।

ছোট-বৌ কিছু বুঝিল না। সে সকল কথাতেই বলিল, "সে আমি কি জানি!"

সংসারের কোন চিন্তা যে তাহাকে কখন ভাবিতে হইবে এমন কথা কি তাহার সহিত ছিল? সকলে আপনার ভাবনা ভাবিবে এবং সকলে মিলিয়া শৈলবালার আরাম চিন্তা করিবে, অকস্মাৎ ইহার ব্যতিক্রম হয়, এ কি ভয়ানক অন্যায়!

তখন নিবারণ শৈলবালার পায়ে ধরিয়া কাঁদিয়া পড়িল। শৈলবালা কেবলি বলিল, "সে আমি জানি না। আমার জিনিষ আমি কেন দিব?"

নিবারণ দেখিল ঐ দুর্ব্বল ক্ষুদ্র সুন্দর সুকুমারী বালিকাটি লোহার সিন্ধুকের অপেক্ষাও কঠিন। হরসুন্দরী সঙ্কটের সময় স্বামীর এই দুর্ব্বলতা দেখিয়া ঘৃণায় জর্জ্জরিত হইয়া উঠিল। শৈলবালা চাবি বলপূর্ব্বক কাড়িয়া লইতে গেল। শৈলবালা তৎক্ষণাৎ চাবির গোচ্ছা প্রাচীর লঙ্ঘন করিয়া পুষ্করিণীর মধ্যে ফেলিয়া দিল।

হরসুন্দরী হতবুদ্ধি স্বামীকে কহিল, "তালা ভাঙ্গিয়া ফেল না!"

শৈলবালা প্রশান্তমুখে বলিল, "তাহা হইলে আমি গলায় দড়ি দিয়া মরিব!"—

নিবারণ কহিল, আমি আর একটা চেষ্টা দেখিতেছি, বলিয়া এলো-থেলো বেশে বাহির হইয়া গেল।

নিবারণ দুই ঘণ্টার মধ্যেই পৈতৃক বাড়ি আড়াই হাজার টাকায় বিক্রয় করিয়া আসিল।

বহুকষ্টে হাতে বেড়িটা বাঁচিল, কিন্তু চাকরী গেল। স্থাবর জঙ্গমের মধ্যে রহিল কেবল দুটিমাত্র স্ত্রী। তাহার মধ্যে ক্লেশ-কাতর বালিকা স্ত্রীটি গর্ভবতী হইয়া নিতান্ত স্থাবর হইয়াই পড়িল। গলির মধ্যে একটি ছোট স্যাঁৎসেঁতে বাড়িতে এই ক্ষুদ্র পরিবার আশ্রয় গ্রহণ করিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

ছোটবৌয়ের অসন্তোষ এবং অসুখের আর শেষ নাই। সে কিছুতেই বুঝিতে চায় না তাহার স্বামীর ক্ষমতা নাই। "ক্ষমতা নাই যদি ত বিবাহ করিলে কেন?"

উপরের তলায় কেবল দুটিমাত্র ঘর। একটি ঘরে নিবারণ ও শৈলবালার শয়নগৃহ। আর একটি ঘরে হরসুন্দরী থাকে।

শৈলবালা খুঁৎখুঁৎ করিয়া বলে, "আমি দিনরাত্রি শোবার ঘরে কাটাইতে পারি না।"

নিবারণ মিথ্যা আশ্বাস দিয়া বলিত, "আমি আর একটা ভাল বাড়ির সন্ধানে আছি, শীঘ্র বাড়ি বদল করিব।"

শৈলবালা বলিত, "কেন, ঐ ত পাশে আর একটা ঘর আছে!"

শৈলবালা তাহার পূর্ব্ব প্রতিবেশিনীদের দিকে কথনো মুখ তুলিয়া চাহে নি। নিবারণের বর্ত্তমান দুরবস্থায় ব্যথিত হইয়া তাহারা একদিন দেখা করিতে আসিল, শৈলবালা ঘরে খিল দিয়া বসিয়া রহিল, কিছুতেই দ্বার খুলিল না। তাহারা চলিয়া গেলে রাগিয়া, কাঁদিয়া, উপবাসী থাকিয়া, হিষ্টিরিয়া করিয়া পাড়া মাথায় করিল। এমনতর উৎপাত প্রায় ঘটিতে লাগিল।

অবশেষে শৈলবালার এই শারীরিক সঙ্কটের অবস্থায় গুরুতর পীড়া হইল, এমন কি গর্ভপাত হইবার উপক্রম হইল।

নিবারণ হরসুন্দরীর দুই হাত ধরিয়া বলিল, "তুমি শৈলকে বাঁচাও।"

হরসুন্দরী দিন নাই রাত্রি নাই শৈলবালার সেবা করিতে লাগিল। তিলমাত্র ত্রুটি হইলে শৈল তাহাকে দুর্ব্বাক্য বলিত, সে একটি উত্তরমাত্র করিত না।

শৈল কিছুতেই সাগু খাইতে চাহিত না, বাটিসুদ্ধ ছুঁড়িয়া

ফেলিত—জ্বরের সময় কাঁচা আমের অম্বল দিয়া ভাত খাইতে চাহিত, না পাইলে রাগিয়া কাঁদিয়া অনর্থপাত করিত—হরসুন্দরী তাহাকে, "লক্ষ্মী আমার", "বোন আমার", "দিদি আমার" বলিয়া শিশুর মত ভুলাইতে চেষ্টা করিত।

কিন্তু শৈলবালা বাঁচিল না। সংসারের সমস্ত সোহাগ আদর লইয়া পরম অসুখ ও অসন্তোষে বালিকার ক্ষুদ্র অসম্পূর্ণ ব্যর্থ জীবন অকালে নষ্ট হইয়া গেল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

নিবারণের প্রথমে খুব একটা আঘাত লাগিল, পরক্ষণেই দেখিল তাহার একটা মস্ত বাঁধন ছিঁড়িয়া গিয়াছে। শোকের মধ্যেও হঠাৎ তাহার একটা মুক্তির আনন্দ বোধ হইল। হঠাৎ মনে হইল এতদিন তাহার বুকের উপর একটা দুঃস্বপ্ন চপিয়া ছিল। চৈতন্য হইয়া মুহূর্ত্তের মধ্যে জীবন নিরতিশয় লঘু হইয়া গেল। মাধবীলতাটির মত এই যে কোমল জীবনপাশ ছিঁড়িয়া গেল, এই কি তাহার আদরের শৈলবালা? হঠাৎ নিশ্বাস টানিয়া দেখিল, না, সে তাহার উদ্বন্ধন-রজ্জু।

আর তাহার চিরজীবনের সঙ্গিনী হরসুন্দরী? দেখিল সেই ত তাহার সমস্ত সংসার একাকিনী অধিকার করিয়া তাহার জীবনের সমস্ত সুখদুঃখের স্মৃতিমন্দিরের মাঝখানে

বসিয়া আছে—কিন্তু তবু মধ্যে একটা বিচ্ছেদ। ঠিক যেন একটি ক্ষুদ্র উজ্জ্বল সুন্দর নিষ্ঠুর ছুরি আসিয়া একটি হৃৎ-পিণ্ডের দক্ষিণ এবং বাম অংশের মাঝখানে বেদনাপূর্ণ বিদারণ-রেখা টানিয়া দিয়া গেছে।

একদিন গভীর রাত্রে সমস্ত সহর যখন নিদ্রিত, নিবারণ ধীরে ধীরে হরসুন্দরীর নিভৃত শয়নকক্ষে প্রবেশ করিল। নীরবে সেই পুরাতন নিয়মমত সেই পুরাতন শয্যার দক্ষিণ অংশ গ্রহণ করিয়া শয়ন করিল। কিন্তু এবার তাহার সেই চির-অধিকারের মধ্যে চোরের মত প্রবেশ করিল।

হরসুন্দরীও একটি কথা বলিল না, নিবারণও একটি কথা বলিল না। উহারা পূর্ব্বে যেরূপ পাশাপাশি শয়ন করিত এখনো সেইরূপ পাশাপাশি শুইল, কিন্তু ঠিক মাঝখানে একটি মৃত বালিকা শুইয়া রহিল, তাহাকে কেহ লঙ্ঘন করিতে পারিল না।

শাস্তি।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

দুখিরাম রুই এবং ছিদাম রুই দুই ভাই সকালে যখন দা হাতে লইয়া জন খাটিতে বাহির হইল তখন তাহাদের দুই স্ত্রীর মধ্যে মহা বকাঝকি চেঁচামেচি চলিতেছে। কিন্তু প্রকৃতির অন্যান্য নানাবিধ নিত্য কলরবের ন্যায় এই কলহ কোলাহলও পাড়াসুদ্ধ লোকের অভ্যাস হইয়া গেছে। তীব্র কণ্ঠস্বর শুনিবামাত্র লোকে পরস্পরকে বলে "ঐ রে বাধিয়া গিয়াছে," অর্থাৎ যেমনটি আশা করা যায় ঠিক তেম্‌নিটি ঘটিয়াছে, আজও স্বভাবের নিয়মের কোন্‌রূপ ব্যত্যয় হয় নাই। প্রভাতে পূর্ব্বদিকে সূর্য্য উঠিলে যেমন কেহ তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করে না তেমনি এই কুরিদের বাড়িতে দুই যায়ের মধ্যে যখন একটা হৈ হৈ পড়িয়া যায় তখন তাহার কারণ নির্ণয়ের জন্য কাহারও কোনরূপ কৌতূহলের উদ্রেক হয় না।

অবশ্য এই কোন্দল-আন্দোলন প্রতিবেশিদের অপেক্ষা দুই স্বামীকে বেশি স্পর্শ করিত সন্দেহ নাই কিন্তু সেটা তাহারা কোনরূপ অসুবিধার মধ্যে গণ্য করিত না। তাহারা দুই ভাই যেন দীর্ঘ সংসারপথ একটা এক্কা গাড়িতে করিয়া চলি-

য়াছে, দুই দিকের দুই স্প্রিংবিহীন চাকার অবিশ্রাম ছড়্ ছড়্ খড়্ খড়্ শব্দটাকে জীবনরথযাত্রার একটা বিধিবিহিত নিয়মের মধ্যেই ধরিয়া লইয়াছে।

বরঞ্চ ঘরে যেদিন কোন শব্দমাত্র নাই, সমস্ত থম্‌থম্ ছম্‌ছম্ করিতেছে, সেদিন একটা আসন্ন অনৈসর্গিক উপদ্রবের আশঙ্কা জন্মিত, সেদিন যে কখন কি হইবে তাহা কেহ হিসাব করিয়া বলিতে পারিত না।

আমাদের গল্পের ঘটনা যেদিন আরম্ভ হইল সেদিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে দুই ভাই যখন জন খাটিয়া শ্রান্তদেহে ঘরে ফিরিয়া আসিল তখন দেখিল স্তব্ধ গৃহ গম্‌গম্ করিতেছে!

বাহিরেও অত্যন্ত গুমট্। দুই প্রহরের সময় খুব এক পস্‌লা বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। এখনও চারিদিকে মেঘ জমিয়া আছে। বাতাসের লেশমাত্র নাই। বর্ষায় ঘরের চারিদিকে জঙ্গল এবং আগাছাগুলা অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিয়াছে, সেখান হইতে এবং জলমগ্ন পাটের ক্ষেত হইতে সিক্ত উদ্ভিজ্জের ঘন গন্ধবাষ্প চতুর্দ্দিকে একটি নিশ্চল প্রাচীরের মত জমাট হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। গোয়ালের পশ্চাদ্বর্ত্তী ডোবার মধ্য হইতে ভেক ডাকিতেছে এবং ঝিল্লিরবে সন্ধ্যার নিস্তব্ধ আকাশ একেবারে পরিপূর্ণ।

অদূরে বর্ষার পদ্মা নবমেঘচ্ছায়ায় বড় স্থির ভয়ঙ্কর ভাব ধারণ করিয়া চলিয়াছে। শস্যক্ষেত্রের অধিকাংশই ভাঙ্গিয়া লোকালয়ের কাছাকাছি আসিয়া পড়িয়াছে। এমন কি,

ভাঙ্গনের ধারে দুই চারিটা আম কাঁঠালগাছের শিকড় বাহির হইয়া দেখা দিয়াছে, যেন তাহাদের নিরুপায় মুষ্টির প্রসারিত অঙ্গুলিগুলি শূন্যে একটা কিছু অন্তিম অবলম্বন আঁকড়িয়া ধরিবার চেষ্টা করিতেছে।

দুখিরাম এবং ছিদাম সেদিন জমিদারের কাছারি-ঘরে কাজ করিতে গিয়াছিল। ওপারের চরে জলিধান পাকিয়াছে। বর্ষায় চর ভাসিয়া যাইবার পূর্ব্বেই ধান কাটিয়া লইবার জন্য দেশের দরিদ্র লোকমাত্রেই কেহ বা নিজের ক্ষেতে কেহ বা পাট খাটিতে নিযুক্ত হইয়াছে; কেবল, কাছারি হইতে পেয়াদা আসিয়া এই দুই ভাইকে জবরদস্তি করিয়া ধরিয়া লইয়া গেল। কাছারি-ঘরে চাল ভেদ করিয়া স্থানে স্থানে জল পড়িতেছিল তাহাই সারিয়া দিতে এবং গোটাকতক ঝাঁপ নির্ম্মাণ করিতে তাহারা সমস্ত দিন খাটিয়াছে। বাড়ি আসিতে পায় নাই, কাছারি হইতেই কিঞ্চিৎ জলপান খাইয়াছে। মধ্যে মধ্যে বৃষ্টিতেও ভিজিতে হইয়াছে,—উচিতমত পাওনা মজুরি পায় নাই, এবং তাহার পরিবর্ত্তে যে সকল অন্যায় কটু কথা শুনিতে হইয়াছে সে তাহাদের পাওনার অনেক অতিরিক্ত।

পথের কাদা এবং জল ভাঙ্গিয়া সন্ধ্যাবেলায় বাড়ি ফিরিয়া আসিয়া দুই ভাই দেখিল, ছোট যা চন্দরা ভূমিতে অঞ্চল পাতিয়া চুপ করিয়া পড়িয়া আছে;—আজিকার এই মেঘ্‌লা দিনের মত সেও মধ্যাহ্নে প্রচুর অশ্রুবর্ষণপূর্ব্বক সায়াহ্নের

কাছাকাছি ক্ষান্ত দিয়া অত্যন্ত গুমট্‌ করিয়া আছে; আর বড় যা রাধা মুখটা মস্ত করিয়া দাওয়ায় বসিয়াছিল—তাহার দেড় বৎসরের ছোট ছেলেটি কাঁদিতেছিল, দুই ভাই যখন প্রবেশ করিল, দেখিল উলঙ্গ শিশু প্রাঙ্গণের এক পার্শ্বে চীৎ হইয়া পড়িয়া ঘুমাইয়া আছে।

ক্ষুধিত দুখিরাম আর কালবিলম্ব না করিয়া বলিল "ভাত দে।"

বড় বৌ বারুদের বস্তায় স্ফুলিঙ্গপাতের মত একমুহূর্ত্তেই তীব্র কণ্ঠস্বর আকাশ পরিমাণ করিয়া বলিয়া উঠিল, "ভাত কোথায় যে ভাত দিব? তুই কি চাল দিয়া গিয়াছিলি? আমি কি নিজে রোজগার করিয়া আনিব?"

সারাদিনের শ্রান্তি ও লাঞ্ছনার পর অন্নহীন নিরানন্দ অন্ধকার ঘরে প্রজ্জ্বলিত ক্ষুধানলে গৃহিণীর রূক্ষবচন, বিশেষতঃ শেষ কথাটার গোপন কুৎসিত শ্লেষ দুখিরামের হঠাৎ কেমন একেবারেই অসহ্য হইয়া উঠিল।

ক্রুদ্ধ ব্যাঘ্রের ন্যায় রুদ্ধ গম্ভীর গর্জ্জনে বলিয়া উঠিল "কি বল্লি!" বলিয়া, মুহূর্ত্তের মধ্যে দা লইয়া কিছু না ভাবিয়া একেবারে স্ত্রীর মাথায় বসাইয়া দিল। রাধা তাহার ছোট যায়ের কোলের কাছে পড়িয়া গেল এবং মৃত্যু হইতে মুহূর্ত্ত বিলম্ব হইল না।

চন্দরা রক্তসিক্ত বস্ত্রে "কি হল গো" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। ছিদাম তাহার মুখ চাপিয়া ধরিল। দুখিরাম

দা ফেলিয়া মুখে হাত দিয়া হতবুদ্ধির মত ভূমিতে বসিয়া পড়িল। ছেলেটা জাগিয়া উঠিয়া ভয়ে চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিল।

বাহিরে তখন পরিপূর্ণ শান্তি। রাখালবালক গরু লইয়া গ্রামে ফিরিয়া আসিতেছে। পরপারের চরে যাহারা নূতনপক্ক ধান কাটিতে গিয়াছিল, তাহারা পাঁচ সাতজনে এক একটি ছোট নৌকায় এপারে ফিরিয়া পরিশ্রমের পুরস্কার দুই চারি আঁটি ধান মাথায় লইয়া প্রায় সকলেই নিজ নিজ ঘরে আসিয়া পৌঁছিয়াছে।

চক্রবর্ত্তীদের বাড়ির রামলোচন খুড়ো গ্রামের ডাকঘরে চিঠি দিয়া ঘরে ফিরিয়া নিশ্চিন্ত মনে চুপচাপ তামাক খাইতেছিলেন। হঠাৎ মনে পড়িল, তাঁহার কোর্ফা প্রজা দুখির অনেক টাকা খাজনা বাকি; আজ কিয়দংশ শোধ করিবে প্রতিশ্রুত হইয়াছিল। এতক্ষণে তাহারা বাড়ি ফিরিয়াছে স্থির করিয়া চাদরটা কাঁধে ফেলিয়া ছাতা লইয়া বাহির হইলেন।

কুরীদের বাড়িতে ঢুকিয়া তাঁহার গা ছম্‌ছম্‌ করিয়া উঠিল। দেখিলেন, ঘরে প্রদীপ জ্বালা হয় নাই। অন্ধকার দাওয়ায় দুই চারিটা অন্ধকার মূর্ত্তি অস্পষ্ট দেখা যাইতেছে। রহিয়া রহিয়া দাওয়ার এক কোণ হইতে একটা অস্ফুট রোদন উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছে—এবং ছেলেটা যত মা মা করিয়া কাঁদিয়া উঠিতে চেষ্টা করিতেছে ছিদাম তাহার মুখ চাপিয়া ধরিতেছে।

রামলোচন কিছু ভীত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "দুখি, আছিস্ না কি!"

দুখি এতক্ষণ প্রস্তরমূর্ত্তির মত নিশ্চল হইয়া বসিয়া ছিল, তাহার নাম ধরিয়া ডাকিবা মাত্র একেবারে অবোধ বালকের মত উচ্ছ্বসিত হইয়া কাঁদিয়া উঠিল।

ছিদাম তাড়াতাড়ি দাওয়া হইতে অঙ্গনে নামিয়া চক্রবর্ত্তীর নিকটে আসিল। চক্রবর্ত্তী জিজ্ঞাসা করিলেন, "মাগীরা বুঝি ঝগড়া করিয়া বসিয়া আছে? আজ ত সমস্ত দিনই চীৎকার শুনিয়াছি।"

এতক্ষণ ছিদাম কিংকর্ত্তব্য কিছুই ভাবিয়া উঠিতে পারে নাই। নানা অসম্ভব গল্প তাহার মাথায় উঠিতেছিল। আপাততঃ স্থির করিয়াছিল রাত্রি কিঞ্চিৎ অধিক হইলে মৃতদেহ কোথাও সরাইয়া ফেলিবে। ইতিমধ্যে যে চক্রবর্ত্তী আসিয়া উপস্থিত হইবে এ সে মনেও করে নাই। ফস্ করিয়া কোন উত্তর যোগাইল না। বলিয়া ফেলিল, "হাঁ, আজ খুব ঝগড়া হইয়া গিয়াছে।"

চক্রবর্ত্তী দাওয়ার দিকে অগ্রসর হইবার উপক্রম করিয়া বলিল, "কিন্তু সে জন্য দুখি কাঁদে কেন রে!"

ছিদাম দেখিল আর রক্ষা হয় না, হঠাৎ বলিয়া ফেলিল— "ঝগড়া করিয়া ছোট বৌ বড় বৌয়ের মাথায় এক দায়ের কোপ বসাইয়া দিয়াছে।"

উপস্থিত বিপদ ছাড়া যে আর কোন বিপদ থাকিতে

পারে এ কথা সহজে মনে হয় না। ছিদাম তখন ভাবিতেছিল, ভীষণ সত্যের হাত হইতে কি করিয়া রক্ষা পাইব? মিথ্যা যে তদপেক্ষা ভীষণ হইতে পারে তাহা তাহার জ্ঞান হইল না। রামলোচনের প্রশ্ন শুনিবামাত্র তাহার মাথায় তৎক্ষণাৎ একটা উত্তর যোগাইল এবং তৎক্ষণাৎ বলিয়া ফেলিল।

রামলোচন চমকিয়া উঠিয়া কহিল, "অ্যাঁ! বলিস্ কি! মরে নাই ত!"

ছিদাম কহিল, "মরিয়াছে!" বলিয়া চক্রবর্ত্তীর পা জড়াইয়া ধরিল।

চক্রবর্ত্তী পালাইবার পথ পায় না। ভাবিল, রাম রাম, সন্ধ্যাবেলায় এ কি বিপদেই পড়িলাম! আদালতে সাক্ষ্য দিতে দিতেই প্রাণ বাহির হইয়া পড়িবে। ছিদাম কিছুতেই তাঁহার পা ছাড়িল না, কহিল "দাদা ঠাকুর, এখন আমার বৌকে বাঁচাইবার কি উপায় করি!"

মাম্‌লা মোকদ্দমার পরামর্শে রামলোচন সমস্ত গ্রামের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। তিনি একটু ভাবিয়া বলিলেন, দেখ্, ইহার এক উপায় আছে। তুই এখনি থানায় ছুটিয়া যা—বল্‌গে, তোর বড় ভাই দুখি সন্ধ্যাবেলায় ঘরে আসিয়া ভাত চাহিয়াছিল; ভাত প্রস্তুত ছিল না বলিয়া স্ত্রীর মাথায় দা বসাইয়া দিয়াছে। আমি নিশ্চয় বলিতেছি এ কথা বলিলে ছুঁড়িটা বাঁচিয়া যাইবে।

ছিদামের কণ্ঠ শুষ্ক হইয়া আসিল; উঠিয়া কহিল, ঠাকুর,

বৌ গেলে বৌ পাইব, কিন্তু আমার ভাই ফাঁসি গেলে আর ত ভাই পাইব না। কিন্তু যখন নিজের স্ত্রীর নামে দোষারোপ করিয়াছিল তখন এ সকল কথা ভাবে নাই। তাড়াতাড়িতে একটা কাজ করিয়া ফেলিয়াছে, এখন অলক্ষিতভাবে মন আপনার পক্ষে যুক্তি এবং প্রবোধ সঞ্চয় করিতেছে।

চক্রবর্ত্তীও কথাটা যুক্তিসঙ্গত বোধ করিলেন, কহিলেন, তবে যেমনটি ঘটিয়াছে তাই বলিস্ সকল দিক্ রক্ষা করা অসম্ভব।

বলিয়া রামলোচন অবিলম্বে প্রস্থান করিল এবং দেখিতে দেখিতে গ্রামে রাষ্ট্র হইল যে, কুরীদের বাড়ির চন্দরা রাগা-রাগি করিয়া তাহার বড় যায়ের মাথায় দা বসাইয়া দিয়াছে।

বাঁধ ভাঙ্গিলে যেমন জল আসে গ্রামের মধ্যে তেমনি হুহুঃ শব্দে পুলিস আসিয়া পড়িল; অপরাধী এবং নিরপরাধী সকলেই বিষম উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

ছিদাম ভাবিল, যে পথ কাটিয়া ফেলিয়াছে সেই পথেই চলিতে হইবে। সে চক্রবর্ত্তীর কাছে নিজ মুখে এক কথা বলিয়া ফেলিয়াছে সে কথা গাঁসুদ্ধ রাষ্ট্র হইয়া পড়িয়াছে, এখন আবার আর একটা কিছু প্রকাশ হইয়া পড়িলে কি জানি কি হইতে কি হইয়া পড়িবে সে নিজেই কিছু ভাবিয়া

পাইল না। মনে করিল কোন মতে সেই কথাটা রক্ষা করিয়া তাহার সহিত আর পাঁচটা গল্প জুড়িয়া স্ত্রীকে রক্ষা করা ছাড়া আর কোন পথ নাই।

ছিদাম তাহার স্ত্রী চন্দরাকে অপরাধ নিজ স্কন্ধে লইবার জন্য অনুরোধ করিল। সে ত একেবারে বজ্রাহত হইয়া গেল। ছিদাম তাহাকে আশ্বাস দিয়া কহিল, যাহা বলিতেছি তাই কর্, তোর কোন ভয় নাই, আমরা তোকে বাঁচাইয়া দিব।—আশ্বাস দিল বটে কিন্তু গলা শুকাইল, মুখ পাংশুবর্ণ হইয়া গেল।

চন্দ্রার বয়স সতেরো আঠারোর অধিক হইবে না। মুখখানি হৃষ্টপুষ্ট গোলগাল—শরীরটি অনতিদীর্ঘ, আঁটসাঁট, সুস্থ সবল; অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মধ্যে এমনি একটি সৌষ্ঠব আছে যে, চলিতে ফিরিতে নড়িতে চড়িতে দেহের কোথাও যেন কিছু বাধে না। একখানি নূতন-তৈরি নৌকার মত; বেশ ছোট এবং সুডৌল, অত্যন্ত সহজে সরে এবং তাহার কোথাও কোন গ্রন্থি শিথিল হইয়া যায় নাই। পৃথিবীর সকল বিষয়েই তাহার একটা কৌতুক এবং কৌতূহল আছে; পাড়ায় গল্প করিতে যাইতে ভাল বাসে; এবং কুম্ভকক্ষে ঘাটে যাইতে আসিতে দুই অঙ্গুলি দিয়া ঘোমটা ঈষৎ ফাঁক করিয়া উজ্জ্বল চঞ্চল ঘনকৃষ্ণ চোখ দুটি দিয়া পথের মধ্যে দর্শনযোগ্য যাহা কিছু সমস্ত দেখিয়া লয়।

বড়বৌ ছিল ঠিক ইহার উল্টা; অত্যন্ত এলোমেলো ঢিলে-

ঢালা অগোছালো। মাথার কাপড়, কোলের শিশু, ঘরকন্নার কাজ কিছুই সে সাম্‌লাইতে পারিত না। হাতে বিশেষ একটা কিছু কাজও নাই অথচ কোন কালে যেন সে অবসর করিয়া উঠিতে পারে না। ছোটযা তাহাকে অধিক কিছু কথা বলিত না, মৃদুস্বরে দুই একটা তীক্ষ্ণ দংশন করিত, আর সে হাউ হাউ দাউ দাউ করিয়া রাগিয়া মাগিয়া বকিয়া ঝকিয়া সারা হইত এবং পাড়াসুদ্ধ অস্থির করিয়া তুলিত।

এই দুই যুড়ি স্বামী স্ত্রীর মধ্যেও একটা আশ্চর্য্য স্বভাবের ঐক্য ছিল। দুখিরাম মানুষটা কিছু বৃহদায়তনের—হাড়গুলা খুব চওড়া—নাসিকা খর্ব্ব—দুটি চক্ষু এই দৃশ্যমান সংসারকে যেন ভাল করিয়া বোঝে না, অথচ ইহাকে কোনরূপ প্রশ্ন করিতেও চায় না। এমন নিরীহ অথচ ভীষণ, এমন সবল অথচ নিরুপায় মানুষ অতি দুর্লভ।

আর ছিদামকে একখানি চক্‌চকে কালো পাথরে কে যেন বহুযত্নে কুঁদিয়া গড়িয়া তুলিয়াছে। লেশমাত্র বাহুল্যবর্জ্জিত এবং কোথাও যেন কিছু টোল খায় নাই। প্রত্যেক অঙ্গটি বলের সহিত নৈপুণ্যের সহিত মিশিয়া অত্যন্ত সম্পূর্ণতা লাভ করিয়াছে। নদীর উচ্চপাড় হইতে নিম্নে লাফাইয়া পড়ুক, লগি দিয়া নৌকা ঠেলুক, বাঁশগাছে চড়িয়া বাছিয়া বাছিয়া কঞ্চী কাটিয়া আনুক, সকল কাজেই তাহার একটি পরিমিত পারিপাট্য, একটি অবলীলা-কৃত শোভা প্রকাশ পায়। বড় বড় কালো চুল তেল দিয়া কপাল হইতে যত্নে আঁচড়াইয়া

তুলিয়া কাঁধে আনিয়া ফেলিয়াছে—বেশভূষা সাজ-সজ্জায় বিলক্ষণ একটু যত্ন আছে।

অপরাপর গ্রামবধূদিগের সৌন্দর্য্যের প্রতি যদিও তাহার উদাসীন দৃষ্টি ছিল না, এবং তাহাদের চক্ষে আপনাকে মনোরম করিয়া তুলিবার ইচ্ছাও তাহার যথেষ্ট ছিল—তবু ছিদাম তাহার যুবতী স্ত্রীকে একটু বিশেষ ভাল বাসিত। উভয়ে ঝগড়াও হইত, ভাবও হইত, কেহ কাহাকে পরাস্ত করিতে পারিত না। আর একটি কারণে উভয়ের মধ্যে বন্ধন কিছু সুদৃঢ় ছিল। ছিদাম মনে করিত চন্দরা যেরূপ চটুল চঞ্চল প্রকৃতির স্ত্রীলোক তাহাকে যথেষ্ট বিশ্বাস নাই, আর চন্দরা মনে করিত, আমার স্বামীটির চতুর্দ্দিকেই দৃষ্টি, তাঁহাকে কিছু কষাকষি করিয়া না বাঁধিলে কোন্ দিন হাতছাড়া হইতে আটক নাই।

উপস্থিত ঘটনা ঘটিবার কিছুকাল পূর্ব্বে হইতে স্ত্রীপুরুষের মধ্যে ভারি একটা গোলযোগ চলিতেছিল। চন্দরা দেখিয়াছিল তাহার স্বামী কাজের ওজর করিয়া মাঝে মাঝে দূরে চলিয়া যায়, এমন কি, দুই একদিন অতীত করিয়া আসে, অথচ কিছু উপার্জ্জন করিয়া আনে না। লক্ষণ মন্দ দেখিয়া সেও কিছু বাড়াবাড়ি দেখাইতে লাগিল। যখন তখন ঘাটে যাইতে আরম্ভ করিল এবং পাড়া পর্য্যটন করিয়া আসিয়া কাশী মজুমদারের মেজ ছেলেটির প্রচুর ব্যাখ্যা করিতে লাগিল।

ছিদামের দিন এবং রাত্রিগুলির মধ্যে কে যেন বিষ মিশা-

ইয়া দিল। কাজে কর্ম্মে কোথাও একদণ্ড গিয়া সুস্থির হইতে পারে না। একদিন ভাজকে আসিয়া ভারি ভর্ৎসনা করিল। সে হাত নাড়িয়া ঝঙ্কার দিয়া অনুপস্থিত মৃত পিতাকে সম্বোধন করিয়া বলিল—ও মেয়ে ঝড়ের আগে ছোটে উহাকে আমি সামলাইব! আমি জানি ও কোন্ দিন কি সর্ব্বনাশ করিয়া বসিবে!

চন্দরা পাশের ঘর হইতে আসিয়া আস্তে আস্তে কহিল "কেন দিদি তোমার এত ভয় কিসের!" এই ত দুই যায়ে বিষম দ্বন্দ্ব বাধিয়া গেল।

ছিদাম চোখ পাকাইয়া বলিল, এবার যদি কখনও শুনি তুই একলা ঘাটে গিয়াছিস্ তোর হাড় গুঁড়াইয়া দিব।

চন্দরা বলিল—তাহা হইলে ত হাড় যুড়ায়!—বলিয়া তৎক্ষণাৎ বাহিরে চলিয়া যাইবার উপক্রম করিল।

ছিদাম একলম্ফে তাহার চুল ধরিয়া টানিয়া ঘরে পুরিয়া বাহির হইতে দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিল।

কর্ম্মস্থান হইতে সন্ধ্যাবেলায় ফিরিয়া আসিয়া দেখে ঘর খোলা, ঘরে কেহ নাই। চন্দরা তিনটে গ্রাম ছাড়াইয়া একেবারে তাহার মামার বাড়ি গিয়া উপস্থিত হইয়াছে।

ছিদাম সেখান হইতে বহুকষ্টে অনেক সাধ্যসাধনায় তাহাকে ঘরে ফিরাইয়া আনিল, কিন্তু এবার পরাস্ত মানিল। দেখিল, এক অঞ্জলি পারদকে মুষ্টির মধ্যে শক্ত করিয়া ধরা যেমন দুঃসাধ্য এই মুষ্টিমেয় স্ত্রীটুকুকেও কঠিন করিয়া ধরিয়া

রাখা তেমনি অসম্ভব—ও যেন দশ আঙুলের ফাঁক দিয়া বাহির হইয়া পড়ে।

আর কোন জবরদস্তি করিল না, কিন্তু বড় অশান্তিতে বাস করিতে লাগিল। তাহার এই চঞ্চলা যুবতী স্ত্রীর প্রতি সদাশঙ্কিত ভালবাসা উগ্র একটা বেদনার মত বিষম টন্‌টনে হইয়া উঠিল। এমন কি, এক একবার মনে হইত এ যদি মরিয়া যায় তবে আমি নিশ্চিন্ত হইয়া একটুখানি শান্তিলাভ করিতে পারি!—মানুষের উপরে মানুষের যতটা ঈর্ষ্যা হয় যমের উপরে এতটা নহে!

এমন সময়ে ঘরে সেই বিপদ ঘটিল।

চন্দরাকে যখন তাহার স্বামী খুন স্বীকার করিয়া লইতে কহিল, সে স্তম্ভিত হইয়া চাহিয়া রহিল। তাহার কালো ছুটি চক্ষু কালো অগ্নির ন্যায় নীরবে তাহার স্বামীকে দগ্ধ করিতে লাগিল। তাহার সমস্ত শরীর মন যেন ক্রমেই সঙ্কুচিত হইয়া এই স্বামীরাক্ষসের হাত হইতে বাহির হইয়া আসিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। তাহার সমস্ত অন্তরাত্মা একান্ত বিমুখ হইয়া দাঁড়াইল।

ছিদাম আশ্বাস দিল তোমার কিছু ভয় নাই।—বলিয়া পুলিসের কাছে ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে কি বলিতে হইবে বারবার শিখাইয়া দিল। চন্দরা সে সমস্ত দীর্ঘ কাহিনী কিছুই শুনিল না, কাঠের মূর্ত্তি হইয়া বসিয়া রহিল।

সমস্ত কাজেই ছিদামের উপর ছুখিরামের একমাত্র নির্ভর।

ছিদাম যখন চন্দরার উপর সমস্ত দোষারোপ করিতে বলিল, দুখি কহিল, তাহা হইলে বৌমার কি হইবে। ছিদাম কহিল, উহাকে আমি বাঁচাইয়া দিব। বৃহৎকায় দুখিরাম নিশ্চিন্ত হইল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

ছিদাম তাহার স্ত্রীকে শিখাইয়া দিয়াছিল যে, তুই বলিস বড় যা আমাকে বঁটি লইয়া মারিতে আসিয়াছিল, আমি তাহাকে দা লইয়া ঠেকাইতে গিয়া হঠাৎ কেমন করিয়া লাগিয়া গিয়াছে। এ সমস্তই রামলোচনের রচিত। ইহার অনুকূলে যে যে অলঙ্কার এবং প্রমাণ প্রয়োগের আবশ্যক তাহাও সে বিস্তারিত ভাবে ছিদামকে শিখাইয়াছিল।

পুলিস আসিয়া তদন্ত করিতে লাগিল। চন্দরাই যে তাহার বড় যাকে খুন করিয়াছে গ্রামের সকল লোকেরই মনে এই বিশ্বাস বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে। সকল সাক্ষীর দ্বারাই সেইরূপ প্রমাণ হইল। পুলিস যখন চন্দরাকে প্রশ্ন করিল, চন্দরা কহিল, হাঁ, আমি খুন করিয়াছি।

কেন খুন করিয়াছ ?

আমি তাহাকে দেখিতে পারিতাম না।

কোন বচসা হইয়াছিল ?

না।

সে তোমাকে প্রথমে মারিতে আসিয়াছিল ?

না।

তোমার প্রতি কোন অত্যাচার করিয়াছিল ?

না।

এইরূপ উত্তর শুনিয়া সকলে অবাক্ হইয়া গেল।

ছিদাম ত একেবারে অস্থির হইয়া উঠিল। কহিল, উনি ঠিক কথা বলিতেছেন না। বড় বৌ প্রথমে—

দারোগা খুব এক তাড়া দিয়া তাহাকে থামাইয়া দিল। অবশেষে তাহাকে বিধিমতে জেরা করিয়া বার বার সেই একই উত্তর পাইল—বড় বৌএর দিক হইতে কোনরূপ আক্রমণ চন্দরা কিছুতেই স্বীকার করিল না।

এমন একগুঁয়ে মেয়েও ত দেখা যায় না। একেবারে প্রাণপণে ফাঁসিকাষ্ঠের দিকে ঝুঁকিয়াছে, কিছুতেই তাহাকে টানিয়া রাখা যায় না। চন্দরা বড় অভিমানে মনে মনে স্বামীকে বলিতেছে, আমি তোমাকে ছাড়িয়া আমার এই নবযৌবন লইয়া ফাঁসিকাঠকে বরণ করিলাম—আমার ইহজন্মের শেষবন্ধন তাহার সহিত।

বন্দিনী হইয়া চন্দরা, একটি নিরীহ ক্ষুদ্র চঞ্চল কৌতুকপ্রিয় গ্রামবধূ, চিরপরিচিত গ্রামের পথ দিয়া, রথের তলা দিয়া, হাটের মধ্য দিয়া, ঘাটের প্রান্ত দিয়া, মজুমদারদের বাড়ির সম্মুখ দিয়া, পোষ্টআফিস এবং ইস্কুল-ঘরের পার্শ্ব দিয়া সমস্ত পরিচিত লোকের চক্ষের উপর দিয়া কলঙ্কের ছাপ

লইয়া চিরকালের মত গৃহ ছাড়িয়া গ্রাম ছাড়িয়া চলিয়া গেল। একপাল ছেলে পিছন পিছন চলিল এবং গ্রামের মেয়েরা তাহার সইসাঙ্গাৎরা কেহ ঘোমটার ফাঁক দিয়া, কেহ দ্বারের প্রান্ত হইতে, কেহ বা গাছের আড়ালে দাঁড়াইয়া পুলিস-চালিত চন্দরাকে দেখিয়া ঘৃণায় লজ্জায় ভয়ে কণ্টকিত হইয়া উঠিল।

ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছেও চন্দরা দোষ স্বীকার করিল। এবং খুনের সময় বড় বৌ যে, তাহার প্রতি কোন রূপ অত্যাচার করিয়াছিল তাহার কথায় তাহা প্রকাশ হইল না।

কিন্তু সেদিন ছিদাম সাক্ষ্যস্থলে আসিয়াই একেবারে কাঁদিয়া যোড়হস্তে কহিল, দোহাই হুজুর আমার স্ত্রীর কোন দোষ নাই। হাকিম ধমক দিয়া তাহার উচ্ছ্বাস নিবারণ করিয়া তাহাকে প্রশ্ন করিতে লাগিলেন, সে একে একে সত্য ঘটনা সমস্ত প্রকাশ করিল।

হাকিম তাহার কথা বিশ্বাস করিলেন না। কারণ, প্রধান বিশ্বস্ত ভদ্রসাক্ষী রামলোচন কহিল, খুনের অনতিবিলম্বেই আমি ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়াছিলাম। সাক্ষী ছিদাম আমার নিকট সমস্ত স্বীকার করিয়া আমার পা জড়াইয়া ধরিয়া কহিল, বৌকে কি করিয়া উদ্ধার করিব আমাকে যুক্তি দিন। আমি ভাল মন্দ কিছুই বলিলাম না। সাক্ষী আমাকে বলিল, আমি যদি বলি আমার বড় ভাই ভাত চাহিয়া ভাত পায় নাই বলিয়া রাগের মাথায় স্ত্রীকে

মারিয়াছে, তাহা হইলে কি সে রক্ষা পাইবে? আমি কহিলাম, খবরদার হারামজাদা, আদালতে এক বর্ণ মিথ্যা বলিস্ না—এতবড় মহাপাপ আর নাই—ইত্যাদি।

রামলোচন প্রথমে চন্দরাকে রক্ষা করিবার উদ্দেশে অনেকগুলা গল্প বানাইয়া তুলিয়াছিল, কিন্তু যখন দেখিল চন্দরা নিজে বাঁকিয়া দাঁড়াইয়াছে, তখন ভাবিল, ওরে বাপ্‌রে, শেষকালে কি মিথ্যা-সাক্ষীর দায়ে পড়িব! যেটুকু জানি সেইটুকু বলা ভাল। এই মনে করিয়া রামলোচন যাহা জানে তাহাই বলিল। বরঞ্চ তাহার চেয়েও কিছু বেশি বলিতে ছাড়িল না।

ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট সেশনে চালান দিলেন।

ইতিমধ্যে চাষবাস হাটবাজার হাসিকান্না পৃথিবীর সমস্ত কাজ চলিতে লাগিল। এবং পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের মত নবীন ধান্যক্ষেত্রে শ্রাবণের অবিরল বৃষ্টিধারা বর্ষিত হইতে লাগিল।

পুলিস আসামী এবং সাক্ষী লইয়া আদালতে হাজির। সম্মুখবর্ত্তী মুন্সেফের কোর্টে বিস্তর লোক নিজ নিজ মকদ্দামার অপেক্ষায় বসিয়া আছে। রন্ধনশালার পশ্চাদ্বর্ত্তী একটি ডোবার অংশ বিভাগ লইয়া কলিকাতা হইতে এক উকীল আসিয়াছে এবং তদুপলক্ষে বাদীর পক্ষে উনচল্লিশ জন সাক্ষী উপস্থিত আছে। কতশত লোক আপন আপন কড়াগণ্ডা হিসাবের চুলচেরা মীমাংসা করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া আসিয়াছে, জগতে আপাততঃ তদপেক্ষা গুরুতর আর কিছুই

উপস্থিত নাই এইরূপ তাহাদের ধারণা। ছিদাম বাতায়ন হইতে এই অত্যন্ত ব্যস্তসমস্ত প্রতিদিনের পৃথিবীর দিকে এক-দৃষ্টে চাহিয়া আছে, সমস্তই স্বপ্নের মত বোধ হইতেছে। কম্পা-উণ্ডের বৃহৎ বটগাছ হইতে একটি কোকিল ডাকিতেছে—তাহাদের কোনরূপ আইন আদালত নাই।

চন্দরা জজের কাছে কহিল, ওগো সাহেব, এক কথা আর বারবার কতবার করিয়া বলিব!

জজসাহেব তাহাকে বুঝাইয়া কহিলেন, তুমি যে অপরাধ স্বীকার করিতেছ তাহার শাস্তি কি জান?

চন্দরা কহিল, না।

জজসাহেব কহিলেন—তাহার শাস্তি ফাঁসি।

চন্দরা কহিল—ওগো তোমার পায়ে পড়ি, তাই দাও না সাহেব! তোমাদের যাহা খুসি কর—আমার ত আর সহ্য হয় না!

যখন ছিদামকে আদালতে উপস্থিত করিল—চন্দরা মুখ ফিরাইল। জজ কহিলেন—সাক্ষীর দিকে চাহিয়া বল এ তোমার কে হয়।

চন্দরা দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া কহিল, ও আমার স্বামী হয়।

প্রশ্ন হইল—ও তোমাকে ভালবাসে না?

উত্তর—উঃ! ভারি ভালবাসে।

প্রশ্ন। তুমি উহাকে ভালবাস না?

উত্তর। খুব ভালবাসি!

ছিদামকে যখন প্রশ্ন হইল, ছিদাম কহিল, আমি খুন করিয়াছি।

প্রশ্ন। কেন?

ছিদাম। ভাত চাহিয়াছিলাম বড় বৌ ভাত দেয় নাই।

দুখিরাম সাক্ষ্য দিতে আসিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। মূর্চ্ছাভঙ্গের পর উত্তর করিল—সাহেব খুন আমি করিয়াছি।

কেন?

ভাত চাহিয়াছিলাম ভাত দেয় নাই।

বিস্তর জেরা করিয়া এবং অন্যান্য সাক্ষ্য শুনিয়া জজ সাহেব স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন—ঘরের স্ত্রীলোককে ফাঁসির অপমান হইতে বাঁচাইবার জন্য ইহারা দুই ভাই অপরাধ স্বীকার করিতেছে। কিন্তু চন্দরা পুলিস হইতে সেশন আদালত পর্য্যন্ত বরাবর এক কথা বলিয়া আসিতেছে, তাহার কথার তিলমাত্র নড়চড় হয় নাই। দুই জন উকীল স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত হইয়া তাহাকে প্রাণদণ্ড হইতে রক্ষা করিবার জন্য বিস্তর চেষ্টা করিয়াছে, কিন্তু অবশেষে তাহার নিকট পরাস্ত মানিয়াছে।

যেদিন একরত্তি বয়সে একটি কালোকোলো ছোটখাটো মেয়ে তাহার গোলগাল মুখটি লইয়া খেলার পুতুল ফেলিয়া বাপের ঘর হইতে শ্বশুরঘরে আসিল, সেদিন রাত্রে শুভলগ্নের সময় আজিকার দিনের কথা কে কল্পনা করিতে পারিত!

তাহার বাপ মরিবার সময় এই বলিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছিল যে, যাহা হউক আমার মেয়েটির একটি সদ্‌গতি করিয়া গেলাম।

জেলখানায় ফাঁসির পূর্ব্বে দয়ালু সিভিল সার্জ্জন চন্দরাকে জিজ্ঞাসা করিল, কাহাকেও দেখিতে ইচ্ছা কর?

চন্দরা কহিল, একবার আমার মাকে দেখিতে চাই।

ডাক্তার কহিল—তোমার স্বামী তোমাকে দেখিতে চায়, তাহাকে কি ডাকিয়া আনিব?

চন্দরা কহিল—মরণ!—

সমাপ্তি।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

অপূর্ব্বকৃষ্ণ বি, এ পাস্ করিয়া কলিকাতা হইতে দেশে ফিরিয়া আসিতেছেন।

নদীটি ক্ষুদ্র। বর্ষা অন্তে প্রায় শুকাইয়া যায়। এখন শ্রাবণের শেষে জলে ভরিয়া উঠিয়া একেবারে গ্রামের বেড়া ও বাঁশঝাড়ের তলদেশ চুম্বন করিয়া চলিয়াছে।

বহুদিন ঘন বর্ষার পরে আজ মেঘমুক্ত আকাশে রৌদ্র দেখা দিয়াছে।

নৌকায় আসীন অপূর্ব্বকৃষ্ণের মনের ভিতরকার একখানি ছবি যদি দেখিতে পাইতাম তবে দেখিতাম সেখানেও এই যুবকের মানস-নদী নববর্ষায় কূলে কূলে ভরিয়া আলোকে জ্বল্‌জ্বল্ এবং বাতাসে ছল্‌ছল্ করিয়া উঠিতেছিল।

নৌকা যথাস্থানে ঘাটে আসিয়া লাগিল। নদীতীর হইতে অপূর্ব্বদের বাড়ির পাকা ছাদ গাছের অন্তরাল দিয়া দেখা যাইতেছে। অপূর্ব্বের আগমন সংবাদ বাড়ির কেহ জানিত না, সেই জন্য ঘাটে লোক আসে নাই। মাঝি ব্যাগ লইতে উদ্যত হইলে অপূর্ব্ব তাহাকে নিবারণ করিয়া নিজেই ব্যাগ হাতে লইয়া আনন্দভরে তাড়াতাড়ি নামিয়া পড়িল।

নামিবামাত্র, তীরে ছিল পিছল, ব্যাগ্‌সমেত অপূর্ব্ব কাদায় পড়িয়া গেল। যেমন পড়া, অম্‌নি কোথা হইতে এক সুমিষ্ট উচ্চকণ্ঠে তরল হাস্যলহরী উচ্ছ্বসিত হইয়া নিকটবর্ত্তী অশথ-গাছের পাখীগুলিকে সচকিত করিয়া দিল।

অপূর্ব্ব অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া তাড়াতাড়ি আত্মসম্বরণ করিয়া চাহিয়া দেখিল। দেখিল, তীরে মহাজনের নৌকা হইতে নূতন ইঁট রাশীকৃত করিয়া নামাইয়া রাখা হইয়াছে, তাহারই উপরে বসিয়া একটি মেয়ে হাস্যবেগে এখনি শতধা হইয়া যাইবে এমনি মনে হইতেছে।

অপূর্ব্ব চিনিতে পারিল তাহাদেরই নূতন প্রতিবেশিনীর মেয়ে মৃণ্ময়ী। দূরে বড় নদীর ধারে ইহাদের বাড়ি ছিল, সেখানে নদীর ভাঙ্গনে দেশ ত্যাগ করিয়া বছর দুই তিন হইল এই গ্রামে আসিয়া বাস করিতেছে।

এই মেয়েটির অখ্যাতির কথা অনেক শুনিতে পাওয়া যায়। পুরুষ গ্রামবাসীরা স্নেহভরে ইহাকে পাগ্‌লি বলে কিন্তু গ্রামের গৃহিণীরা ইহার উচ্ছৃঙ্খল স্বভাবে সর্ব্বদা ভীত চিন্তিত শঙ্কান্বিত। গ্রামের যত ছেলেদের সহিতই ইহার খেলা; সম-বয়সী মেয়েদের প্রতি অবজ্ঞার সীমা নাই। শিশুরাজ্যে এই মেয়েটি একটি ছোটখাটো বর্গির উপদ্রব বলিলেই হয়।

বাপের আদরের মেয়ে কি না সেই জন্য ইহার এতটা দুর্দ্দান্ত প্রতাপ। এই সম্বন্ধে বন্ধুদের নিকট মৃণ্ময়ীর মা স্বামীর বিরুদ্ধে সর্ব্বদা অভিযোগ করিতে ছাড়িত না, অথচ, বাপ

ইহাকে ভালবাসে, বাপ কাছে থাকিলে মৃণ্ময়ীর চোখের অশ্রুবিন্দু তাহার অন্তরে বড়ই বাজিত ইহাই মনে করিয়া প্রবাসী স্বামীকে স্মরণপূর্ব্বক মৃণ্ময়ীর মা মেয়েকে কিছুতেই কাঁদাইতে পারিত না।

মৃণ্ময়ী দেখিতে শ্যামবর্ণ। ছোট কোঁকড়া চুল পিঠ পর্য্যন্ত পড়িয়াছে। ঠিক যেন বালকের মত মুখের ভাব। মস্ত মস্ত দুটি কালো চক্ষুতে না আছে লজ্জা, না আছে ভয়, না আছে হাবভাবলীলার লেশমাত্র। শরীর দীর্ঘ পরিপুষ্ট সুস্থ সবল, কিন্তু তাহার বয়স অধিক কি অল্প সে প্রশ্ন কাহারও মনে উদয় হয় না; যদি হইত, তবে এখনো অবিবাহিত আছে বলিয়া লোকে তাহার পিতামাতাকে নিন্দা করিত। গ্রামের বিদেশী জমিদারের নৌকা কালক্রমে যেদিন ঘাটে আসিয়া লাগে সেদিন গ্রামের লোকেরা সম্ভ্রমে শশব্যস্ত হইয়া উঠে, ঘাটের মেয়েদের মুখরঙ্গভূমিতে অকস্মাৎ নাসাগ্রভাগ পর্য্যন্ত যবনিকা পতন হয়, কিন্তু মৃণ্ময়ী কোথা হইতে একটা উলঙ্গ শিশুকে কোলে লইয়া কোঁকড়া চুলগুলি পিঠে দোলাইয়া ছুটিয়া ঘাটে আসিয়া উপস্থিত। যে দেশে ব্যাধ নাই বিপদ নাই সেই দেশের হরিণ-শিশুর মত নির্ভীক কৌতূহলে দাঁড়াইয়া চাহিয়া চাহিয়া দেখিতে থাকে, অবশেষে আপন দলের বালক-সঙ্গীদের নিকট ফিরিয়া গিয়া এই নবাগত প্রাণীর আচারব্যবহার সম্বন্ধে বিস্তর বাহুল্য বর্ণনা করে।

আমাদের অপূর্ব্ব ইতিপূর্ব্বে ছুটি উপলক্ষে বাড়ি আসিয়া

এই বন্ধনবিহীন বালিকাটিকে দুই চারিবার দেখিয়াছে এবং অবকাশের সময় এমন কি অনবকাশের সময়ও ইহার সম্বন্ধে চিন্তা করিয়াছে। পৃথিবীতে অনেক মুখ চোখে পড়ে কিন্তু এক একটি মুখ বলাকহা নাই একেবারে মনের মধ্যে গিয়া উত্তীর্ণ হয়। সে কেবল সৌন্দর্য্যের জন্য নহে, আর একটা কি গুণ আছে। সে গুণটি বোধ করি স্বচ্ছতা। অধিকাংশ মুখের মধ্যেই মনুষ্যপ্রকৃতিটি আপনাকে অপরিস্ফুটরূপে প্রকাশ করিতে পারে না; যে মুখে সেই অন্তরগুহাবাসী রহস্যময় লোকটি অবাধে বাহির হইয়া দেখা দেয়, সে মুখ সহস্রের মধ্যে চোখে পড়ে এবং এক পলকে মনে মুদ্রিত হইয়া যায়। এই বালিকার মুখে চক্ষে একটি দুরন্ত অবাধ্য নারীপ্রকৃতি উন্মুক্ত বেগবান অরণ্যমৃগের মত সর্ব্বদা দেখা দেয়, খেলা করে, সেইজন্য এই জীবনচঞ্চল মুখখানি একবার দেখিলে আর সহজে ভোলা যায় না।

পাঠকদিগকে বলা বাহুল্য মৃণ্ময়ীর কৌতুকহাস্যধ্বনি যতই সুমিষ্ট হউক্ দুর্ভাগা অপূর্ব্বের পক্ষে কিঞ্চিৎ ক্লেশদায়ক হইয়াছিল। সে তাড়াতাড়ি মাঝির হাতে ব্যাগ সমর্পণ করিয়া রক্তিমমুখে দ্রুতবেগে গৃহ অভিমুখে চলিতে লাগিল।

আয়োজনটি অতি সুন্দর হইয়াছিল। নদীর তীর, গাছের ছায়া, পাখীর গান, প্রভাতের রৌদ্র, কুড়ি বৎসর বয়স; অবশ্য ইঁটের স্তূপটা তেমন উল্লেখযোগ্য নহে, কিন্তু যে ব্যক্তি তাহার উপর বসিয়াছিল সে এই শুষ্ক কঠিন আসনের প্রতিও

একটি মনোরম শ্রী বিস্তার করিয়াছিল। হায়, এমন দৃশ্যের মধ্যে প্রথম পদক্ষেপমাত্রেই, যে, সমস্ত কবিত্ব প্রহসনে পরিণত হয় ইহা অপেক্ষা অদৃষ্টের নিষ্ঠুরতা আর কি হইতে পারে!

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

সেই ইষ্টকশিখর হইতে প্রবহমান হাস্যধ্বনি শুনিতে শুনিতে চাদরে ও বাগে কাদা মাখিয়া গাছের ছায়া দিয়া অপূর্ব্ব বাড়িতে গিয়া উপস্থিত হইল।

অকস্মাৎ পুত্রের আগমনে তাহার বিধবা মাতা পুলকিত হইয়া উঠিলেন। তৎক্ষণাৎ ক্ষীর দধি রুইমাছের সন্ধানে দূরে নিকটে লোক দৌড়িল এবং পাড়া প্রতিবেশীর মধ্যেও একটা আন্দোলন উপস্থিত হইল।

আহারান্তে মা অপূর্ব্বর বিবাহের প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন। অপূর্ব্ব সে জন্য প্রস্তুত হইয়া ছিল। কারণ, প্রস্তাব অনেক পূর্ব্বেই ছিল কিন্তু পুত্র নব্যতন্ত্রের নূতন ধুয়া ধরিয়া জেদ করিয়া বসিয়াছিল যে, বি, এ, পাস না করিয়া বিবাহ করিব না। এতকাল জননী সেই জন্য অপেক্ষা করিয়াছিলেন অতএব এখন আর কোনরূপ ওজর করা মিথ্যা। অপূর্ব্ব কহিল, আগে পাত্রী দেখা হউক তাহার পর স্থির হইবে। মা কহিলেন, পাত্রী দেখা হইয়াছে, সে জন্য তোকে ভাবিতে হইবে না। অপূর্ব্ব ঐ ভাবনাটা নিজে ভাবিতে প্রস্তুত হইল

এবং কহিল মেয়ে না দেখিয়া বিবাহ করিতে পারিবে না। মা ভাবিলেন এমন সৃষ্টিছাড়া কথাও কখনো শোনা যায় নাই, কিন্তু সম্মত হইলেন।

সে রাত্রে অপূর্ব্ব প্রদীপ নিবাইয়া বিছানায় শয়ন করিলে পর বর্ষানিশীথের সমস্ত শব্দ এবং সমস্ত নিস্তব্ধতার পরপ্রান্ত হইতে বিজন বিনিদ্র শয্যায় একটি উচ্ছ্বসিত উচ্চ মধুর কণ্ঠের হাস্যধ্বনি তাহার কানে আসিয়া ক্রমাগত বাজিতে লাগিল। মন নিজেকে কেবলি এই বলিয়া পীড়া দিতে লাগিল যে, সকালবেলাকার সেই পদস্খলনটা যেন কোন একটা উপায়ে সংশোধন করিয়া লওয়া উচিত। বালিকা জানিল না যে, আমি অপূর্ব্বকৃষ্ণ অনেক বিদ্যা উপার্জ্জন করিয়াছি, কলিকাতায় বহুকাল যাপন করিয়া আসিয়াছি, দৈবাৎ পিছলে পা দিয়া কাদার উপর পড়িয়া গেলেও আমি উপহাস্য উপেক্ষণীয় একজন যে-সে গ্রাম্য যুবক নহি।

পরদিন অপূর্ব্ব কনে দেখিতে যাইবে। অধিক দূর নহে, পাড়াতেই তাহাদের বাড়ি। একটু বিশেষ যত্নপূর্ব্বক সাজ করিল। ধূতি ও চাদর ছাড়িয়া সিল্কের চাপকান জোব্বা, মাথায় একটা গোলাকার পাগড়ি, এবং বার্ণিশকরা নূতন একযোড়া জুতা পায়ে দিয়া সিল্কের ছাতা হস্তে সে প্রাতঃকালে বাহির হইল।

সম্ভাবিত শ্বশুরবাড়িতে পদার্পণ করিবামাত্র মহা সমারোহ সমাদরের ঘটা পড়িয়া গেল। অবশেষে যথাকালে কম্পিত-

হৃদয় মেয়েটিকে ঝাড়িয়া মুছিয়া রঙ করিয়া খোপায় রাঙতা জড়াইয়া একখানি পাতলা রঙীন কাপড়ে মুড়িয়া বরের সম্মুখে আনিয়া উপস্থিত করা হইল। সে এক কোণে নীরবে মাথা প্রায় হাঁটুর কাছে ঠেকাইয়া বসিয়া রহিল এবং এক প্রৌঢ়া দাসী তাহাকে সাহস দিবার জন্য পশ্চাতে উপস্থিত রহিল। কনের এক বালক ভাই তাহাদের পরিবারের মধ্যে এই এক নূতন অনধিকার-প্রবেশোদ্যত লোকটির পাগড়ি, ঘড়ির চেন এবং নবোদ্গত শ্মশ্রু একমনে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। অপূর্ব্ব কিয়ৎকাল গোঁফে তা দিয়া দিয়া অবশেষে গম্ভীরভাবে জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কি পড়? বসনভূষণাচ্ছন্ন লজ্জাস্তূপের নিকট হইতে তাহার কোন উত্তর পাওয়া গেল না। দুই তিনবার প্রশ্ন এবং প্রৌঢ়া দাসীর নিকট হইতে পৃষ্ঠ-দেশে বিস্তর উৎসাহজনক করতাড়নের পর বালিকা মৃদুস্বরে এক নিশ্বাসে অত্যন্ত দ্রুত বলিয়া গেল, চারুপাঠ দ্বিতীয় ভাগ, ব্যাকরণসার প্রথম ভাগ, ভূগোলবিবরণ, পাটিগণিত, ভারত-বর্ষের ইতিহাস। এমন সময় বহির্দ্দেশে একটা অশান্ত গতির ধুপ্‌ধাপ্‌ শব্দ শোনা গেল এবং মুহূর্ত্তের মধ্যে দৌড়িয়া হাঁপাইয়া পিঠের চুল দোলাইয়া মৃণ্ময়ী ঘরে আসিয়া প্রবেশ করিল। অপূর্ব্বকৃষ্ণের প্রতি দৃক্‌পাতমাত্র না করিয়া একেবারে কনের ভাই রাখালের হাত ধরিয়া টানাটানি আরম্ভ করিয়া দিল। রাখাল তখন আপন পর্য্যবেক্ষণ শক্তির চর্চ্চায় একান্তমনে নিযুক্ত ছিল, সে কিছুতেই উঠিতে চাহিল না। দাসীটি তাহার

সংযত কণ্ঠস্বরের মৃদুতা রক্ষার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া যথাসাধ্য তীব্রভাবে মৃণ্ময়ীকে ভর্ৎসনা করিতে লাগিল। অপূর্ব্বকৃষ্ণ আপনার সমস্ত গাম্ভীর্য্য এবং গৌরব একত্র করিয়া পাগ্‌ড়ি-পরা মস্তকে অভ্রভেদী হইয়া বসিয়া রহিল এবং পেটের কাছে ঘড়ির চেন নাড়িতে লাগিল। অবশেষে সঙ্গীটিকে কিছুতেই বিচলিত করিতে না পারিয়া তাহার পিঠে একটা সশব্দ চপেটাঘাত করিয়া এবং চট্ করিয়া কনের মাথার ঘোমটা টানিয়া খুলিয়া দিয়া ঝড়ের মত মৃণ্ময়ী ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। দাসীটি গুমরিয়া গর্জ্জন করিতে লাগিল এবং ভগ্নীর অকস্মাৎ অবগুণ্ঠন মোচনে রাখাল খিল্‌খিল্ শব্দে হাসিতে আরম্ভ করিল। নিজের পৃষ্ঠের প্রবল চপেটাঘাতটি সে অন্যায়-প্রাপ্য মনে করিল না, কারণ, এরূপ দেনা পাওনা তাহাদের মধ্যে সর্ব্বদাই চলিতেছে। এমন কি, পূর্ব্বে মৃণ্ময়ীর চুল কাঁধ ছাড়াইয়া পিঠের মাঝামাঝি আসিয়া পড়িত; রাখালই এক-দিন হঠাৎ পশ্চাৎ হইতে আসিয়া তাহার ঝুঁটির মধ্যে কাঁচি চালাইয়া দেয়। মৃণ্ময়ী তখন অত্যন্ত রাগ করিয়া তাহার হাত হইতে কাঁচিটি কাড়িয়া লইয়া নিজের অবশিষ্ট পশ্চাতের চুল কাঁচ্ ক্যাঁচ্ শব্দে নির্দ্দয়ভাবে কাটিয়া ফেলিল, তাহার কোঁকড়া চুলের স্তবকগুলি শাখাচ্যুত কালো আঙুরের স্তূপের মত গুচ্ছ গুচ্ছ মাটিতে পড়িয়া গেল। উভয়ের মধ্যে এইরূপ শাসন-প্রণালী প্রচলিত ছিল।

অতঃপর এই নীরব পরীক্ষা-সভা আর অধিকক্ষণ স্থায়ী

হইল না। পিণ্ডাকার কন্যাটি কোন মতে পুনশ্চ দীর্ঘাকার হইয়া দাসী সহকারে অন্তঃপুরে চলিয়া গেল। অপূর্ব্ব পরম গম্ভীরভাবে বিরল গুম্ফরেখায় তা দিতে দিতে উঠিয়া ঘরের বাহিরে যাইতে উদ্যত হইল। দ্বারের নিকটে গিয়া দেখে বার্ণিশ-করা নূতন জুতাযোড়াটি যেখানে ছিল সেখানে নাই এবং কোথায় আছে তাহাও বহুচেষ্টায় অবধারণ করা গেল না।

বাড়ির লোক সকলেই বিষম বিব্রত হইয়া উঠিল এবং অপরাধীর উদ্দেশে গালি ও ভর্ৎসনা অজস্র বর্ষিত হইতে লাগিল। অনেক খোঁজ করিয়া অবশেষে অনন্যোপায় হইয়া বাড়ির কর্ত্তার পুরাতন ছিন্ন ঢিলা চটিযোড়াটা পরিয়া প্যাণ্ট-লুন চাপকান পাগড়ি সমেত সুসজ্জিত অপূর্ব্ব কর্দ্দমাক্ত গ্রাম-পথে অত্যন্ত সাবধানে চলিতে লাগিল।

পুষ্করিণীর ধারে নির্জ্জন পথপ্রান্তে আবার হঠাৎ সেই উচ্চকণ্ঠের অজস্র হাস্যকলোচ্ছ্বাস। যেন তরুপল্লবের মধ্য হইতে কৌতুকপ্রিয়া বনদেবী অপূর্ব্বর ঐ অসঙ্গত চটিজুতা-যোড়ার দিকে চাহিয়া হঠাৎ আর হাসি ধারণ করিয়া রাখিতে পারিল না।

অপূর্ব্ব অপ্রতিভভাবে থমকিয়া দাঁড়াইয়া ইতস্ততঃ নিরী-ক্ষণ করিতেছে এমন সময় ঘন বন হইতে বাহির হইয়া একটি নির্লজ্জ অপরাধিনী তাঁহার সম্মুখে নূতন জুতাযোড়াটা রাখি-য়াই পলায়নোদ্যত হইল। অপূর্ব্ব দ্রুতবেগে দুই হাত ধরিয়া তাহাকে বন্দী করিয়া ফেলিল।

মৃণ্ময়ী আঁকিয়া বাঁকিয়া হাত ছাড়াইয়া পালাইবার চেষ্টা করিল কিন্তু পারিল না। কোঁকড়া চুলে বেষ্টিত তাহার পরিপুষ্ট সাহাস্য দুষ্ট মুখখানির উপরে শাখান্তরালচ্যুত সূর্য্যকিরণ আসিয়া পড়িল। রৌদ্রোজ্জ্বল নির্ম্মল চঞ্চল নির্ঝরিণীর দিকে অবনত হইয়া কৌতূহলী পথিক যেমন নিবিষ্ট দৃষ্টিতে তাহার তলদেশ দেখিতে থাকে অপূর্ব্ব তেমনি করিয়া গভীর গম্ভীর নেত্রে মৃণ্ময়ীর উর্দ্ধোৎক্ষিপ্ত মুখের উপর, তড়িত্তরল দুটি চক্ষুর মধ্যে, চাহিয়া দেখিল এবং অত্যন্ত ধীরে ধীরে মুষ্টি শিথিল করিয়া যেন যথাকর্ত্তব্য অসম্পন্ন রাখিয়া বন্দিনীকে ছাড়িয়া দিল। অপূর্ব্ব যদি রাগ করিয়া মৃণ্ময়ীকে ধরিয়া মারিত তাহা হইলে সে কিছুই অশ্চর্য্য হইত না, কিন্তু নির্জ্জন পথের মধ্যে এই অপরূপ নীরব শাস্তির সে কোন অর্থ বুঝিতে পারিল না।

নৃত্যময়ী প্রকৃতির নূপুরনিক্কণের ন্যায় চঞ্চল হাস্যধ্বনিটি সমস্ত আকাশ ব্যাপিয়া বাজিতে লাগিল। এবং চিন্তানিমগ্ন অপূর্ব্বকৃষ্ণ অত্যন্ত ধীর পদক্ষেপে বাড়িতে আসিয়া উপস্থিত হইল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

অপূর্ব্ব সমস্তদিন নানা ছুতা করিয়া অন্তঃপুরে মার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেল না। বাহিরে নিমন্ত্রণ ছিল খাইয়া আসিল। অপূর্ব্বর মত এমন একজন কৃতবিদ্য গম্ভীর ভাবুক লোক

একটি সামান্য অশিক্ষিতা বালিকার কাছে আপনার লুপ্ত গৌরব উদ্ধার করিবার, আপনার আন্তরিক মাহাত্ম্যের পরিপূর্ণ পরিচয় দিবার জন্য কেন যে এতটা বেশি উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিবে তাহা বুঝা কঠিন। একটি পাড়াগাঁয়ের চঞ্চল মেয়ে তাঁহাকে সামান্য লোক মনে করিলই বা! সে যদি মুহূর্ত্তকালের জন্য তাঁহাকে হাস্যাস্পদ করিয়া তার পর তাঁহার অস্তিত্ব বিস্মৃত হইয়া রাখাল নামক একটি নির্ব্বোধ নিরক্ষর বালকের সহিত খেলা করিবার জন্য ব্যগ্রতা প্রকাশ করে তাহাতেই বা তাঁহার ক্ষতি কি? তাহার কাছে প্রমাণ করিবার আবশ্যক কি যে, তিনি বিশ্বদীপ নামক মাসিক পত্রে গ্রন্থ সমালোচনা করিয়া থাকেন, এবং তাঁহার তোরঙ্গের মধ্যে এসেন্স্, জুতা, রুবিনির ক্যাম্ফর, রঙীন চিঠির কাগজ এবং "হার্ম্মোনিয়ম্ শিক্ষা" বহির সঙ্গে একখানি পরিপূর্ণ খাতা নিশীথের গর্ভে ভাবী উষার ন্যায় প্রকাশের প্রতীক্ষায় রহিয়াছে? কিন্তু মনকে বুঝানো কঠিন এবং এই পল্লিবাসিনী চঞ্চলা মেয়েটির কাছে শ্রীযুক্ত অপূর্ব্বকৃষ্ণ রায় বি, এ, কিছুতেই পরাভব স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহে।

সন্ধ্যার সময়ে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলে মা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কেমন রে অপূ, মেয়ে কেমন দেখ্‌লি? পছন্দ হয় ত?

অপূর্ব্ব কিঞ্চিৎ অপ্রতিভভাবে কহিল, মেয়ে দেখেছি মা, ওর মধ্যে একটিকে আমার পছন্দ হয়েচে।

মা আশ্চর্য্য হইয়া কহিলেন, তুই আবার ক'টি মেয়ে দেখ্‌লি?

অবশেষে অনেক ইতস্ততর পর প্রকাশ পাইল প্রতিবেশিনী শরতের মেয়ে মৃণ্ময়ীকে তাঁহার ছেলে পছন্দ করিয়াছে! এত লেখাপড়া শিখিয়া এম্‌নি ছেলের পছন্দ!

প্রথমে অপূর্ব্বর পক্ষে অনেকটা পরিমাণ লজ্জা ছিল, অবশেষে মা যখন প্রবল আপত্তি করিতে লাগিলেন তখন তাহার লজ্জা ভাঙ্গিয়া গেল। সে রোখের মাথায় বলিয়া বসিল মৃণ্ময়ীকে ছাড়া আর কাহাকেও বিবাহ করিব না। অন্য জড়-পুত্তলী মেয়েটিকে সে যতই কল্পনা করিতে লাগিল ততই বিবাহ সম্বন্ধে তাহার বিষম বিতৃষ্ণার উদ্রেক হইল।

দুই তিনদিন উভয়পক্ষে মান অভিমান অনাহার অনিদ্রার পর অপূর্ব্বই জয়ী হইল। মা মনকে বোঝাইলেন যে, মৃণ্ময়ী ছেলেমানুষ এবং মৃণ্ময়ীর মা উপযুক্ত শিক্ষাদানে অসমর্থ; বিবাহের পর তাঁহার হাতে পড়িলেই তাহার স্বভাবের পরিবর্ত্তন হইবে। এবং ক্রমশঃ ইহাও বিশ্বাস করিলেন যে, মৃণ্ময়ীর মুখখানি সুন্দর। কিন্তু তখনি আবার তাহার খর্ব্ব কেশরাশি তাঁহার কল্পনাপথে উদিত হইয়া হৃদয় নৈরাশ্যে পূর্ণ করিতে লাগিল তথাপি আশা করিলেন দৃঢ় করিয়া চুল বাঁধিয়া এবং জব্‌জবে করিয়া তেল লেপিয়া কালে এ ত্রুটিও সংশোধন হইতে পারিবে।

পাড়ার লোকে সকলেই অপূর্ব্বর এই পছন্দটিকে অপূর্ব্ব

পছন্দ বলিয়া নামকরণ করিল। পাগ্লী মৃণ্ময়ীকে অনেকেই ভালবাসিত কিন্তু তাই বলিয়া নিজের পুত্রের বিবাহযোগ্যা বলিয়া কেহ মনে করিত না।

মৃণ্ময়ীর বাপ ঈশান মজুমদারকে যথাকালে সংবাদ দেওয়া হইল। সে কোন একটি ষ্টীমার কোম্পানির কেরাণীরূপে দূরে নদীতীরবর্ত্তী একটি ক্ষুদ্র ষ্টেশনে একটি ছোট টীনের ছাদ-বিশিষ্ট কুটীরে মাল ওঠানো নাবানো এবং টিকিট বিক্রয় কার্য্যে নিযুক্ত ছিল।

তাহার মৃণ্ময়ীর বিবাহ প্রস্তাবে দুই চক্ষু বহিয়া জল পড়িতে লাগিল। তাহার মধ্যে কতখানি দুঃখ এবং কতখানি আনন্দ ছিল পরিমাণ করিয়া বলিবার কোন উপায় নাই।

কন্যার বিবাহ উপলক্ষে ঈশান হেড আফিসের সাহেবের নিকট ছুটি প্রার্থনা করিয়া দরখাস্ত দিল। সাহেব উপলক্ষ্যটা নিতান্তই তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া ছুটি নামঞ্জুর করিয়া দিলেন। তখন, পূজার সময় একসপ্তাহ ছুটি পাইবার সম্ভাবনা জানাইয়া সে পর্য্যন্ত বিবাহ স্থগিত রাখিবার জন্য দেশে চিঠি লিখিয়া দিল, কিন্তু অপূর্ব্বর মা কহিল, এই মাসে দিন ভাল আছে আর বিলম্ব করিতে পারিব না।

উভয়তই প্রার্থনা অগ্রাহ্য হইলে পর ব্যথিত হৃদয়ে ঈশান আর কোন আপত্তি না করিয়া পূর্ব্বমত মাল ওজন এবং টিকিট বিক্রয় করিতে লাগিল।

অতঃপর মৃণ্ময়ীর মা এবং পল্লির যত বর্ষীয়সীগণ সকলে

মিলিয়া ভাবী কর্ত্তব্য সম্বন্ধে মৃণ্ময়ীকে অহর্নিশি উপদেশ দিতে লাগিল। ক্রীড়াসক্তি, দ্রুতগমন, উচ্চহাস্য, বালকদিগের সহিত আলাপ এবং ক্ষুধা অনুসারে ভোজন সম্বন্ধে সকলেই নিষেধ-পরামর্শ দিয়া বিবাহটাকে বিভীষিকারূপে প্রতিপন্ন করিতে সম্পূর্ণ কৃতকার্য্য হইল। উৎকণ্ঠিত শঙ্কিতহৃদয় মৃণ্ময়ী মনে করিল তাহার যাবজ্জীবন কারাদণ্ড এবং তদবসানে ফাঁসির হুকুম হইয়াছে।

সে দুষ্ট পোনি ঘোড়ার মত ঘাড় বাঁকাইয়া পিছু হটিয়া বলিয়া বসিল, আমি বিবাহ করিব না।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

কিন্তু তথাপি বিবাহ করিতে হইল।

তার পরে শিক্ষা আরম্ভ হইল। একরাত্রির মধ্যে মৃণ্ময়ীর সমস্ত পৃথিবী অপূর্ব্বর মার অন্তঃপুরে আসিয়া আবদ্ধ হইয়া গেল।

শাশুড়ি সংশোধনকার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। অত্যন্ত কঠিন মুখ করিয়া কহিলেন, দেখ বাছা, তুমি কিছু আর কচি খুঁকি নও, আমাদের ঘরে অমন বেহায়াপনা করিলে চলিবে না।

শাশুড়ি যে ভাবে বলিলেন মৃণ্ময়ী সে ভাবে কথাটা গ্রহণ করিল না। সে ভাবিল এঘরে যদি না চলে তবে বুঝি অন্যত্র যাইতে হইবে। অপরাহ্নে তাহাকে আর দেখা গেল না।

কোথায় গেল কোথায় গেল খোঁজ পড়িল। অবশেষে বিশ্বাস-ঘাতক রাখাল তাহাকে তাহার গোপন স্থান হইতে ধরাইয়া দিল। সে বটতলায় রাধাকান্ত ঠাকুরের পরিত্যক্ত ভাঙ্গা রথের মধ্যে গিয়া বসিয়াছিল।

শাশুড়ি, মা এবং পাড়ার সমস্ত হিতৈষিণীগণ মৃণ্ময়ীকে যেরূপ লাঞ্ছনা করিল তাহা পাঠকগণ এবং পাঠিকাগণ সহজেই কল্পনা করিতে পারিবেন!

রাত্রে ঘন মেঘ করিয়া ঝুপ্ ঝুপ্ শব্দে বৃষ্টি হইতে আরম্ভ হইল। অপূর্ব্বকৃষ্ণ বিছানার মধ্যে অতি ধীরে ধীরে মৃণ্ময়ীর নিকট ঈষৎ অগ্রসর হইয়া তাহার কানে কানে মৃদুস্বরে কহিল, "মৃণ্ময়ী তুমি আমাকে ভালবাস না?"

মৃণ্ময়ী সতেজে বলিয়া উঠিল, "না! আমি তোমাকে কখ্খনই ভাল বাসব না।" তাহার যত রাগ এবং যত শাস্তি-বিধান সমস্তই পুঞ্জীভূত বজ্রের ন্যায় অপূর্ব্বর মাথার উপর নিক্ষেপ করিল।

অপূর্ব্ব ক্ষুণ্ণ হইয়া কহিল, "কেন আমি তোমার কাছে কি দোষ করেছি?" মৃণ্ময়ী কহিল, "তুমি আমাকে বিয়ে করলে কেন?"

এ অপরাধের সন্তোষজনক কৈফিয়ৎ দেওয়া কঠিন। কিন্তু অপূর্ব্ব মনে মনে কহিল, যেমন করিয়া হউক্ এই দুর্বাধ্য মনটিকে বশ করিতে হইবে।

পরদিন শাশুড়ি মৃণ্ময়ীর বিদ্রোহী ভাবের সমস্ত লক্ষণ

দেখিয়া তাহাকে ঘরে দরজা বন্ধ করিয়া রাখিয়া দিল। সে নূতন পিঞ্জরাবদ্ধ পাখীর মত প্রথম অনেকক্ষণ ঘরের মধ্যে ধড়ফড় করিয়া বেড়াইতে লাগিল। অবশেষে কোথাও পালাইবার কোন পথ না দেখিয়া নিষ্ফল ক্রোধে বিছানার চাদরখানা দাঁত দিয়া ছিঁড়িয়া কুটি কুটি করিয়া ফেলিল—এবং মাটির উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া মনে মনে বাবাকে ডাকিতে ডাকিতে কাঁদিতে লাগিল।

এমন সময়ে ধীরে ধীরে কে তাহার পাশে আসিয়া বসিল। সস্নেহে তাহার ধূলিলুণ্ঠিত চুলগুলি কপোলের উপর হইতে তুলিয়া দিবার চেষ্টা করিল। মৃণ্ময়ী সবলে মাথা নাড়িয়া তাহার হাত সরাইয়া দিল। অপূর্ব্ব কানের কাছে মুখ নত করিয়া মৃদুস্বরে কহিল, "আমি লুকিয়ে দরজা খুলে দিয়েছি। এস আমরা খিড়কির বাগানে পালিয়ে যাই।" মৃণ্ময়ী প্রবলবেগে মাথা নাড়িয়া সতেজে সরোদনে কহিল, "না।" অপূর্ব্ব তাহার চিবুক ধরিয়া মুখ তুলিয়া দিবার চেষ্টা করিয়া কহিল, "একবার দেখ কে এসেছে!" রাখাল ভূপতিত মৃণ্ময়ীর দিকে চাহিয়া হতবুদ্ধির ন্যায় দ্বারের কাছে দাঁড়াইয়া ছিল। মৃণ্ময়ী মুখ না তুলিয়া অপূর্ব্বর হাত ঠেলিয়া দিল। অপূর্ব্ব কহিল, "রাখাল তোমার সঙ্গে খেলা করতে এসেচে, খেল্‌তে যাবে?" সে বিরক্তি-উচ্ছ্বসিত স্বরে কহিল, "না।" রাখালও সুবিধা নয় বুঝিয়া কোন মতে ঘর হইতে পালাইয়া হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল। অপূর্ব্ব চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। মৃণ্ময়ী কাঁদিতে

কাঁদিতে শ্রান্ত হইয়া ঘুমাইয়া পড়িল, তখন অপূর্ব্ব পা টিপিয়া বাহির হইয়া দ্বারে শিকল দিয়া চলিয়া গেল।

তাহার পর দিন মৃণ্ময়ী বাপের কাছ হইতে এক পত্র পাইল। তিনি তাঁহার প্রাণপ্রতিমা মৃণ্ময়ীর বিবাহের সময় উপস্থিত থাকিতে পারেন নাই বলিয়া বিলাপ করিয়া নব-দম্পতিকে অন্তরের আশীর্ব্বাদ পাঠাইয়াছেন।

মৃণ্ময়ী শাশুড়িকে গিয়া কহিল, "আমি বাবার কাছে যাব।" শাশুড়ি অকস্মাৎ এই অসম্ভব প্রার্থনায় তাহাকে ভর্ৎসনা করিয়া উঠিলেন। "কোথায় ওর বাপ থাকে তার ঠিকানা নেই, বলে বাপের কাছে যাব! অনাসৃষ্টি আবদার!" সে উত্তর না করিয়া চলিয়া গেল। আপনার ঘরে গিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া নিতান্ত হতশ্বাস ব্যক্তি যেমন করিয়া দেবতার কাছে প্রার্থনা করে তেমনি করিয়া বলিতে লাগিল, "বাবা, আমাকে তুমি নিয়ে যাও! এখানে আমার কেউ নেই! এখানে থাক্‌লে আমি বাঁচব না।"

গভীর রাত্রে তাহার স্বামী নিদ্রিত হইলে ধীরে ধীরে দ্বার খুলিয়া মৃণ্ময়ী গৃহের বাহির হইল। যদিও এক একবার মেঘ করিয়া আসিতেছিল তথাপি জ্যোৎস্না-রাত্রে পথ দেখিবার মত আলোক যথেষ্ট ছিল। বাপের কাছে যাইতে হইলে কোন্ পথ অবলম্বন করিতে হইবে মৃণ্ময়ী তাহার কিছুই জানিত না। কেবল তাহার মনের বিশ্বাস ছিল যে পথ দিয়া ডাকের পত্রবাহক "রানার"গণ চলে সেই পথ দিয়া পৃথিবীর সমস্ত

ঠিকানায় যাওয়া যায়। মৃণ্ময়ী সেই ডাকের পথ ধরিয়া চলিতে লাগিল। চলিতে চলিতে শরীর শ্রান্ত হইয়া আসিল রাত্রিও প্রায় শেষ হইল। বনের মধ্যে যখন উস্‌খুস্‌ করিয়া অনিশ্চিত সুরে দুটো একটা পাখী ডাকিবার উপক্রম করিতেছে অথচ নিঃসংশয়ে সময় নির্ণয় করিতে না পারিয়া ইতস্ততঃ করিতেছে তখন মৃণ্ময়ী পথের শেষে নদীর ধারে একটা বৃহৎ বাজারের মত স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল। অতঃপর কোন্‌দিকে যাইতে হইবে ভাবিতেছে এমন সময় পরিচিত ঝম্‌ঝম্‌ শব্দ শুনিতে পাইল। চিঠির থলে কাঁধে করিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে ডাকের রানার আসিয়া উপস্থিত হইল। মৃণ্ময়ী তাড়াতাড়ি তাহার কাছে গিয়া কাতর শ্রান্তস্বরে কহিল, "কুশীগঞ্জে আমি বাবার কাছে যাব, আমাকে তুমি সঙ্গে নিয়ে চল না!" সে কহিল, "কুশীগঞ্জ কোথায় আমি জানিনে।" এই বলিয়া ঘাটে বাঁধা ডাক-নৌকার মাঝিকে জাগাইয়া দিয়া নৌকা ছাড়িয়া দিল। তাহার দয়া করিবার বা প্রশ্ন করিবার সময় নাই।

দেখিতে দেখিতে ঘাট এবং বাজার সজাগ হইয়া উঠিল। মৃণ্ময়ী ঘাটে নামিয়া একজন মাঝিকে ডাকিয়া কহিল, "মাঝি, আমাকে কুশীগঞ্জে নিয়ে যাবে?" মাঝি তাহার উত্তর দিবার পূর্ব্বেই পাশের নৌকা হইতে একজন বলিয়া উঠিল, "আরে কেও? মিনু মা তুমি এখানে কোথা থেকে?" মৃণ্ময়ী উচ্ছ্বসিত ব্যগ্রতার সহিত বলিয়া উঠিল, "বনমালি, আমি কুশীগঞ্জে বাবার কাছে যাব, আমাকে তোর নৌকায় নিয়ে চল্‌।"

বনমালী তাহাদের গ্রামের মাঝি; সে এই উচ্ছৃঙ্খল-প্রকৃতি বালিকাটিকে বিলক্ষণ চিনিত, সে কহিল "বাবার কাছে যাবে? সেত বেশ কথা! চল আমি তোমাকে নিয়ে যাচ্চি।" মৃণ্ময়ী নৌকায় উঠিল।

মাঝি নৌকা ছাড়িয়া দিল। মেঘ করিয়া মুষলধারে বৃষ্টি আরম্ভ হইল। ভাদ্রমাসের পূর্ণ নদী ফুলিয়া ফুলিয়া নৌকা দোলাইতে লাগিল, মৃণ্ময়ীর সমস্ত শরীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন হইয়া আসিল; অঞ্চল পাতিয়া সে নৌকার মধ্যে শয়ন করিল, এবং এই দুরন্ত বালিকা নদী-দোলায় প্রকৃতির স্নেহপালিত শান্ত শিশুটির মত অকাতরে ঘুমাইতে লাগিল।

জাগিয়া উঠিয়া দেখিল, সে তাহার শ্বশুরবাড়িতে খাটে শুইয়া আছে। তাহাকে জাগ্রত দেখিয়া ঝি বকিতে আরম্ভ করিল। ঝির কণ্ঠস্বরে শাশুড়ি আসিয়া অত্যন্ত কঠিন কঠিন করিয়া বলিতে লাগিলেন। মৃণ্ময়ী বিস্ফারিত নেত্রে নীরবে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। অবশেষে তিনি যখন তাহার বাপের শিক্ষাদোষেব উপর কটাক্ষ করিয়া বলিলেন, তখন মৃণ্ময়ী দ্রুতপদে পাশের ঘরে প্রবেশ করিয়া ভিতর হইতে শিকল বন্ধ করিয়া দিল।

অপূর্ব্ব লজ্জার মাথা খাইয়া মাকে আসিয়া বলিল, "মা বৌকে দুই একদিনের জন্যে একবার বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দিতে দোষ কি?"

মা অপূর্ব্বকে ন ভূত ন ভবিষ্যতি ভৎর্সনা করিতে লাগি-

লেন, এবং দেশে এত মেয়ে থাকিতে বাছিয়া বাছিয়া এই অস্থিদাহকারী দস্যু-মেয়েকে ঘরে আনার জন্য তাহাকে যথেষ্ট গঞ্জনা করিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

সে দিন সমস্ত দিন বাহিরে ঝড়বৃষ্টি এবং ঘরের মধ্যেও অনুরূপ দুর্য্যোগ চলিতে লাগিল।

তাহার পরদিন গভীর রাত্রে অপূর্ব্ব মৃণ্ময়ীকে ধীরে ধীরে জাগ্রত করিয়া কহিল, "মৃণ্ময়ী, তোমার বাবার কাছে যাবে?"

মৃণ্ময়ী সবেগে অপূর্ব্বর হাত চাপিয়া ধরিয়া সচকিত হইয়া কহিল "যাব।"

অপূর্ব্ব চুপিচুপি কহিল, "তবে এস আমরা দুজনে আস্তে আস্তে পালিয়ে যাই। আমি ঘাটে নৌকা ঠিক করে' রেখেছি।"

মৃণ্ময়ী অত্যন্ত সকৃতজ্ঞ হৃদয়ে একবার স্বামীর মুখের দিকে চাহিল। তাহার পর তাড়াতাড়ি উঠিয়া কাপড় ছাড়িয়া বাহির হইবার জন্য প্রস্তুত হইল। অপূর্ব্ব তাহার মাতার চিন্তা দূর করিবার জন্য একখানি পত্র রাখিয়া দিয়া দুইজনে বাহির হইল।

মৃণ্ময়ী সেই অন্ধকার রাত্রে জনশূন্য নিস্তব্ধ নির্জ্জন গ্রামপথে এই প্রথম, স্বেচ্ছায় আন্তরিক নির্ভরের সহিত স্বামীর

হাত ধরিল; তাহার হৃদয়ের আনন্দ উদ্বেগ সেই সুকোমল স্পর্শযোগে তাহার স্বামীর শিরার মধ্যে সঞ্চারিত হইতে লাগিল!

নৌকা সেই রাত্রেই ছাড়িয়া দিল। অশান্ত হর্ষোচ্ছ্বাস সত্বেও অনতিবিলম্বেই মৃণ্ময়ী ঘুমাইয়া পড়িল। পরদিন কি মুক্তি, কি আনন্দ! দুইধারে কত গ্রাম, বাজার, শস্যক্ষেত্র, বন, দুইধারে কত নৌকা যাতায়াত করিতেছে। মৃণ্ময়ী প্রত্যেক তুচ্ছ বিষয়ে স্বামীকে সহস্রবার করিয়া প্রশ্ন করিতে লাগিল। ঐ নৌকায় কি আছে, উহারা কোথা হইতে আসিতেছে, এই জায়গার নাম কি এমন সকল প্রশ্ন যাহার উত্তর অপূর্ব্ব কোন কলেজের বহিতে পায় নাই এবং যাহা তাহার কলিকাতার অভিজ্ঞতায় কুলাইয়া উঠে না। বন্ধুগণ শুনিয়া লজ্জিত হইবেন, অপূর্ব্ব এই সকল প্রশ্নের প্রত্যেকটারই উত্তর করিয়াছিল এবং অধিকাংশ উত্তরের সহিত সত্যের ঐক্য হয় নাই। যথা, সে তিলের নৌকাকে তিসির নৌকা, পাঁচবেড়েকে রায়নগর এবং মুন্সেফের আদালতকে জমিদারী কাছারি বলিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত বোধ করে নাই। এবং এই সমস্ত ভ্রান্ত উত্তরে বিশ্বস্তহৃদয় প্রশ্নকারিণীর সন্তোষের তিলমাত্র ব্যাঘাত জন্মায় নাই।

পরদিন সন্ধ্যাবেলায় নৌকা কুশীগঞ্জে গিয়া পৌঁছিল। টিনের ঘরে একখানি ময়লা চৌকা কাঁচের লণ্ঠনে তেলের বাতি জ্বালাইয়া ছোট ডেস্কের উপর একখানি চামড়ায় বাঁধা

মস্ত খাতা রাখিয়া—গা-খোলা ঈশানচন্দ্র টুলের উপর বসিয়া হিসাব লিখিতেছিলেন। এমন সময় নবদম্পতি ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। মৃণ্ময়ী ডাকিল, "বাবা!" সে ঘরে এমন কণ্ঠধ্বনি এমন করিয়া কখনো ধ্বনিত হয় নাই।

ঈশানের চোখ দিয়া দরদর্ করিয়া অশ্রু পড়িতে লাগিল। সে কি বলিবে কি করিবে কিছুই ভাবিয়া পাইল না। তাহার মেয়ে এবং জামাই যেন সাম্রাজ্যের যুবরাজ এবং যুবরাজ-মহিষী; এই সমস্ত পাটের বস্তার মধ্যে তাহাদের উপযুক্ত সিংহাসন কেমন করিয়া নির্ম্মিত হইতে পারে ইহাই যেন তাহার দিশাহারা বুদ্ধি ঠিক করিয়া উঠিতে পারিল না।

তাহার পর আহারের ব্যাপার—সেও এক চিন্তা। দরিদ্র কেরাণী নিজ হস্তে ডাল ভাতে ভাত পাক করিয়া খায়—আজ এই এমন আনন্দের দিনে সে কি করিবে কি খাওয়াইবে! মৃণ্ময়ী কহিল, "বাবা আজ আমরা সকলে মিলিয়া রাঁধিব।" অপূর্ব্ব এই প্রস্তাবে সাতিশয় উৎসাহ প্রকাশ করিল।

ঘরের মধ্যে স্থানাভাব, লোকাভাব, অন্নাভাব, কিন্তু ক্ষুদ্র ছিদ্র হইতে ফোয়ারা যেমন চতুর্গুণ বেগে উত্থিত হয় তেমনি দারিদ্র্যের সঙ্কীর্ণ মুখ হইতে আনন্দ পরিপূর্ণ ধারায় উচ্ছ্বসিত হইতে লাগিল।

এমনি করিয়া তিন দিন কাটিল। দুই বেলা নিয়মিত ষ্টীমার আসিয়া লাগে, কত লোক কত কোলাহল; সন্ধ্যা-

বেলায় নদীতীর একেবারে নির্জ্জন হইয়া যায়, তখন কি অবাধ স্বাধীনতা! এবং তিন জনে মিলিয়া নানা প্রকার যোগাড় করিয়া, ভুল করিয়া, এক করিতে আরেক করিয়া তুলিয়া রাঁধা-বাড়া। তাহার পরে মৃণ্ময়ীর বলয়ঝঙ্কৃত স্নেহ-হস্তের পরিবেশনে শ্বশুর জামাতার একত্রে আহার, এবং গৃহিণীপনার সহস্র ত্রুটি প্রদর্শনপূর্ব্বক মৃণ্ময়ীকে পরিহাস ও তাহা লইয়া বালিকার আনন্দকলহ এবং মৌখিক অভিমান।

অবশেষে অপূর্ব্ব জানাইল আর অধিক দিন থাকা উচিত হয় না। মৃণ্ময়ী করুণস্বরে আরও কিছু দিন সময় প্রার্থনা করিল। ঈশান কহিল কাজ নাই।

বিদায়ের দিন কন্যাকে বুকের কাছে টানিয়া তাহার মাথায় হাত রাখিয়া অশ্রুগদ্গদকণ্ঠে ঈশান কহিল, "মা, তুমি শ্বশুরঘর উজ্জ্বল করিয়া লক্ষ্মী হইয়া থাকিয়ো। কেহ যেন আমার মীনুর কোন দোষ না ধরিতে পারে!"

মৃণ্ময়ী কাঁদিতে কাঁদিতে স্বামীর সহিত বিদায় হইল। এবং ঈশান সেই দ্বিগুণ নিরানন্দ সঙ্কীর্ণ ঘরের মধ্যে ফিরিয়া গিয়া দিনের পর দিন, মাসের পর মাস নিয়মিত মাল ওজন করিতে লাগিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

এই অপরাধীযুগল গৃহে ফিরিয়া আসিলে মা অত্যন্ত গম্ভীর-ভাবে রহিলেন, কোন কথাই কহিলেন না। কাহারও ব্যবহারের প্রতি এমন কোন দোষারোপ করিলেন না যাহা সে ক্ষালন করিবার চেষ্টা করিতে পারে। এই নীরব অভিযোগ এই নিস্তব্ধ অভিমান লৌহভারের মত সমস্ত ঘরকন্নার উপর অটলভাবে চাপিয়া রহিল।

অবশেষে অসহ্য হইয়া উঠিলে অপূর্ব্ব আসিয়া কহিল, "মা, কালেজ খুলেচে এখন আমাকে আইন পড়তে যেতে হবে।"

মা উদাসীন ভাবে কহিলেন "বৌয়ের কি করবে?"

অপূর্ব্ব কহিল "বৌ এখানেই থাক্!"

মা কহিলেন "না বাপু, কাজ নাই! তুমি তাকে তোমার সঙ্গেই নিয়ে যাও।" সচরাচর মা অপূর্ব্বকে তুই সম্ভাষণ করিয়া থাকেন।

অপূর্ব্ব অভিমানক্ষুণ্ণস্বরে কহিল "আচ্ছা!"

কলিকাতা যাইবার আয়োজন পড়িয়া গেল। যাইবার আগের রাত্রে অপূর্ব্ব বিছানায় আসিয়া দেখিল মৃণ্ময়ী কাঁদিতেছে।

হঠাৎ তাহার মনে আঘাত লাগিল। বিষণ্ণ কণ্ঠে কহিল "মৃণ্ময়ী, আমার সঙ্গে কলকাতায় যেতে তোমার ইচ্ছে করচে না?"

মৃণ্ময়ী কহিল—"না।"

অপূর্ব্ব জিজ্ঞাসা করিল "তুমি আমাকে ভালবাস না?" এ প্রশ্নের কোন উত্তর পাইল না। অনেক সময় এই প্রশ্নটির উত্তর অতিশয় সহজ কিন্তু আবার এক এক সময় ইহার মধ্যে মনস্তত্ত্বঘটিত এত জটিলতার সংস্রব থাকে যে, বালিকার নিকট হইতে তাহার উত্তর প্রত্যাশা করা যায় না।

অপূর্ব্ব প্রশ্ন করিল "রাখালকে ছেড়ে যেতে তোমার মন কেমন করচে?"

মৃণ্ময়ী অনায়াসে উত্তর করিল "হাঁ।"

বালক রাখালের প্রতি এই বি, এ, পরীক্ষোত্তীর্ণ কৃতবিদ্য যুবকের সূচির মত অতি সূক্ষ্ম অথচ অতি সুতীক্ষ্ণ ঈর্ষ্যার উদয় হইল। কহিল "আমি অনেক কাল আর বাড়ি আস্‌তে পাব না।" এই সংবাদ সম্বন্ধে মৃণ্ময়ীর কোন বক্তব্য ছিল না। "বোধ হয় দু-বৎসর কিম্বা তারো বেশি হতে পারে।" মৃণ্ময়ী আদেশ করিল "তুমি ফিরে আস্‌বার সময় রাখালের জন্যে একটা তিনমুখো রাজাসের ছুরি কিনে নিয়ে এসো।"

অপূর্ব্ব শয়ান অবস্থা হইতে ঈষৎ উত্থিত হইয়া কহিল "তুমি তা হলে এইখানেই থাক্‌বে?"

মৃণ্ময়ী কহিল "হাঁ, আমি মায়ের কাছে গিয়ে থাক্‌ব!"

অপূর্ব্ব নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল "আচ্ছা, তাই থেকো! যতদিন না তুমি আমাকে আস্‌বার জন্যে চিঠি লিখ্‌বে, আমি আস্‌ব না। খুব খুসি হলে?"

মৃণ্ময়ী এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া বাহুল্য বোধ করিয়া ঘুমাইতে লাগিল, কিন্তু অপূর্ব্বর ঘুম হইল না। বালিশ উঁচু করিয়া ঠেসান দিয়া বসিয়া রহিল।

অনেক রাত্রে হঠাৎ চাঁদ উঠিয়া চাঁদের আলো বিছানার উপর আসিয়া পড়িল। অপূর্ব্ব সেই আলোকে মৃণ্ময়ীর দিকে চাহিয়া দেখিল। চাহিয়া চাহিয়া মনে হইল যেন রাজকন্যাকে কে রূপার কাঠি ছোঁয়াইয়া অচেতন করিয়া রাখিয়া গিয়াছে। একবার কেবল সোনার কাঠি পাইলেই এই নিদ্রিত আত্মাটিকে জাগাইয়া তুলিয়া মালা বদল করিয়া লওয়া যায়। রূপার কাঠি হাস্য, আর সোনার কাঠি অশ্রুজল।

ভোরের বেলায় অপূর্ব্ব মৃণ্ময়ীকে জাগাইয়া দিল—কহিল, "মৃণ্ময়ী আমার যাইবার সময় হইয়াছে। চল তোমাকে তোমার মার বাড়ি রাখিয়া আসি।"—

মৃণ্ময়ী শয্যাত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলে অপূর্ব্ব তাহার দুই হাত ধরিয়া কহিল, "এখন আমার একটি প্রার্থনা আছে। আমি অনেক সময় তোমার অনেক সাহায্য করিয়াছি আজ যাইবার সময় তাহার একটি পুরস্কার দিবে?"

মৃণ্ময়ী বিস্মিত হইয়া কহিল, "কি?"

অপূর্ব্ব কহিল, "তুমি ইচ্ছা করিয়া ভালবাসিয়া আমাকে একটি চুম্বন দাও।"

অপূর্ব্বর এই অদ্ভুত প্রার্থনা এবং গম্ভীর মুখভাব দেখিয়া মৃণ্ময়ী হাসিয়া উঠিল। হাস্য সম্বরণ করিয়া মুখ বাড়াইয়া চুম্বন

করিতে উদ্যত হইল—কাছাকাছি গিয়া আর পারিল না, খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল—এমন দুইবার চেষ্টা করিয়া অবশেষে নিরস্ত হইয়া মুখে কাপড় দিয়া হাসিতে লাগিল। শাসনচ্ছলে অপূর্ব্ব তাহার কর্ণমূল ধরিয়া নাড়িয়া দিল।

অপূর্ব্বর বড় কঠিন পণ। দস্যুবৃত্তি করিয়া কাড়িয়া লুঠিয়া লওয়া সে আত্মাবমাননা মনে করে। সে দেবতার ন্যায় সগৌরবে থাকিয়া স্বেচ্ছানীত উপহার চায়, নিজের হাত দিয়া কিছুই তুলিয়া লইবে না। অত্যধিক হৃদয়-রস-লালসায় হৃদয়ের সংযোগ ব্যতীত কোন সামগ্রীই তাহার মুখে রুচে না।

মৃণ্ময়ী আর হাসিল না। তাহাকে প্রত্যূষের আলোকে নির্জ্জন পথ দিয়া তাহার মার বাড়ি রাখিয়া অপূর্ব্ব গৃহে আসিয়া মাতাকে কহিল, "ভাবিয়া দেখিলাম, বৌকে আমার সঙ্গে কলিকাতায় লইয়া গেলে আমার পড়াশুনার ব্যাঘাত হইবে, সেখানে উহারও কেহ সঙ্গিনী নাই। তুমি ত তাহাকে এ বাড়িতে রাখিতে চাও না আমি তাই তাহার মার বাড়িতেই রাখিয়া আসিলাম।"

সুগভীর অভিমানের মধ্যে মাতাপুত্রের বিচ্ছেদ হইল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

মার বাড়িতে আসিয়া মৃণ্ময়ী দেখিল কিছুতেই আর মন লাগিতেছে না। সে বাড়ির আগাগোড়া যেন বদল হইয়া গেছে। সময় আর কাটে না। কি করিবে কোথায় যাইবে কাহার সহিত দেখা করিবে ভাবিয়া পাইল না।

মৃণ্ময়ীর হঠাৎ মনে হইল যেন সমস্ত গৃহে এবং সমস্ত গ্রামে কেহ লোক নাই। যেন মধ্যাহ্নে সূর্য্যগ্রহণ হইল। কিছুতেই বুঝিতে পারিল না, আজ কলিকাতায় চলিয়া যাইবার জন্য এত প্রাণপণ ইচ্ছা করিতেছে কাল রাত্রে এই ইচ্ছা কোথায় ছিল! কাল সে জানিত না যে, জীবনের যে অংশ পরিহার করিয়া যাইবার জন্য এত মন-কেমন করিতেছিল তৎপূর্ব্বেই তাহার সম্পূর্ণ স্বাদ পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে। গাছের পক্কপত্রের ন্যায় আজ সেই বৃন্তচ্যুত অতীত জীবনটাকে ইচ্ছাপূর্ব্বক অনায়াসে দূরে ছুঁড়িয়া ফেলিল।

গল্পে শুনা যায়, নিপুণ অস্ত্রকার এমন সূক্ষ্ম তরবারী নির্ম্মাণ করিতে পারে যে, তদ্দ্বারা মানুষকে দ্বিখণ্ড করিলেও সে জানিতে পারে না, অবশেষে নাড়া দিলে দুই অর্দ্ধখণ্ড ভিন্ন হইয়া যায়। বিধাতার তরবারী সেইরূপ সূক্ষ্ম, কখন্ তিনি মৃণ্ময়ীর বাল্য ও যৌবনের মাঝখানে আঘাত করিয়াছিলেন সে জানিতে পারে নাই; আজ কেমন করিয়া নাড়া পাইয়া

বাল্য-অংশ যৌবন হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়িল এবং মৃণ্ময়ী বিস্মিত হইয়া ব্যথিত হইয়া চাহিয়া রহিল।

মাতৃগৃহে তাহার সেই পুরাতন শয়ন-গৃহকে আর আপনার বলিয়া মনে হইল না, সেখানে যে থাকিত সে হঠাৎ আর নাই। এখন হৃদয়ের সমস্ত স্মৃতি সেই আর একটা বাড়ি আর একটা ঘর আর একটা শয্যার কাছে গুন্‌গুন্‌ করিয়া বেড়াইতে লাগিল।

মৃণ্ময়ীকে আর কেহ বাহিরে দেখিতে পাইল না। তাহার হাস্যধ্বনি আর শুনা যায় না। রাখাল তাহাকে দেখিলে ভয় করে। খেলার কথা মনেও আসে না।

মৃণ্ময়ী মাকে বলিল, "মা আমাকে শ্বশুর-বাড়ি রেখে আয়।"

এদিকে, বিদায়কালীন পুত্রের বিষণ্ণমুখ স্মরণ করিয়া অপূর্ব্বর মার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়। সে যে রাগ করিয়া বৌকে বেহানের বাড়ি রাখিয়া আসিয়াছে ইহা তাঁহার মনে বড়ই বিঁধিতে লাগিল।

হেনকালে একদিন মাথায় কাপড় দিয়া মৃণ্ময়ী ম্লানমুখে শাশুড়ির পায়ের কাছে পড়িয়া প্রণাম করিল। শাশুড়ি তৎক্ষণাৎ ছলছলনেত্রে তাহাকে বক্ষে চাপিয়া ধরিলেন। মুহূর্ত্তের মধ্যে উভয়ের মিলন হইয়া গেল। শাশুড়ি বধূর মুখের দিকে চাহিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন। সে মৃণ্ময়ী আর নাই। এমন পরিবর্ত্তন সাধারণতঃ সকলের সম্ভব নহে। বৃহৎ পরিবর্ত্তনের জন্য বৃহৎ বলের আবশ্যক।

শাশুড়ি স্থির করিয়াছিলেন, মৃণ্ময়ীর দোষগুলির একটি একটি করিয়া সংশোধন করিবেন, কিন্তু আর একজন অদৃশ্য সংশোধনকর্ত্তা একটি অজ্ঞাত সংক্ষেপ উপায় অবলম্বন করিয়া মৃণ্ময়ীকে যেন নূতন জন্ম পরিগ্রহ করাইয়া দিলেন।

এখন শাশুড়িকেও মৃণ্ময়ী বুঝিতে পারিল, শাশুড়িও মৃণ্ময়ীকে চিনিতে পারিলেন; তরুর সহিত শাখাপ্রশাখার যেরূপ মিল, সমস্ত ঘরকন্না তেমনি পরস্পর অখণ্ডসম্মিলিত হইয়া গেল।

এই যে একটি গম্ভীর স্নিগ্ধ বিশাল রমণীপ্রকৃতি মৃণ্ময়ীর সমস্ত শরীরে ও সমস্ত অন্তরে রেখায় রেখায় ভরিয়া ভরিয়া উঠিল ইহাতে তাহাকে যেন বেদনা দিতে লাগিল। প্রথম আষাঢ়ের শ্যামসজল নব মেঘের মত তাহার হৃদয়ে একটি অশ্রুপূর্ণ বিস্তীর্ণ অভিমানের সঞ্চার হইল। সেই অভিমান তাহার চোখের ছায়াময় সুদীর্ঘ পল্লবের উপর আর একটি গভীরতর ছায়া নিক্ষেপ করিল। সে মনে মনে বলিতে লাগিল, আমি আমাকে বুঝিতে পারি নাই বলিয়া তুমি আমাকে বুঝিলে না কেন? তুমি আমাকে শাস্তি দিলে না কেন? তোমার ইচ্ছানুসারে আমাকে চালনা করাইলে না কেন? আমি রাক্ষসী যখন তোমার সঙ্গে কলিকাতায় যাইতে চাহিলাম না তুমি আমাকে জোর করিয়া ধরিয়া লইয়া গেলে না কেন? তুমি আমার কথা শুনিলে কেন, আমার অনুরোধ মানিলে কেন, আমার অবাধ্যতা সহিলে কেন?

তাহার পর, অপূর্ব্ব যেদিন প্রভাতে পুষ্করিণীতীরের নির্জ্জন পথে তাহাকে বন্দী করিয়া কিছু না বলিয়া একবার কেবল তাহার মুখের দিকে চাহিয়াছিল সেই পুষ্করিণী সেই পথ সেই তরুতল সেই প্রভাতের রৌদ্র এবং সেই হৃদয়ভারাবনত গভীর দৃষ্টি তাহার মনে পড়িল এবং হঠাৎ সে তাহার সমস্ত অর্থ বুঝিতে পারিল। তাহার পর, সেই বিদায়ের দিনের যে চুম্বন অপূর্ব্বর মুখের দিকে অগ্রসর হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছিল, সেই অসম্পূর্ণ চুম্বন এখন মরুমরীচিকাভিমুখী তৃষার্ত্ত পাখীর ন্যায় ক্রমাগত সেই অতীত অবসরের দিকে ধাবিত হইতে লাগিল কিছুতেই তাহার আর পিপাসা মিটিল না। এখন থাকিয়া থাকিয়া মনে কেবল উদয় হয়, আহা, অমুক সময়টিতে যদি এমন করিতাম, অমুক প্রশ্নের যদি এই উত্তর দিতাম, তখন যদি এমন হইত!

অপূর্ব্বর মনে এই বলিয়া ক্ষোভ জন্মিয়াছিল, যে, মৃণ্ময়ী আমার সম্পূর্ণ পরিচয় পায় নাই; মৃণ্ময়ীও আজ বসিয়া বসিয়া ভাবে, তিনি আমাকে কি মনে করিলেন, কি বুঝিয়া গেলেন! অপূর্ব্ব তাহাকে যে দুরন্ত চপল অবিবেচক নির্ব্বোধ বালিকা বলিয়া জানিল, পরিপূর্ণ হৃদয়ামৃতধারায় প্রেমপিপাসা মিটাইতে সক্ষম রমণী বলিয়া পরিচয় পাইল না ইহাতেই সে পরিতাপে লজ্জায় ধিক্কারে পীড়িত হইতে লাগিল। চুম্বনের এবং সোহাগের যে ঋণগুলি অপূর্ব্বর মাথার বালিশের উপর পরিশোধ করিতে লাগিল। এমনিভাবে কত দিন কাটিল।

অপূর্ব্ব বলিয়া গিয়াছিল, তুমি চিঠি না লিখিলে আমি বাড়ি ফিরিব না। মৃণ্ময়ী তাহাই স্মরণ করিয়া একদিন ঘরে দ্বাররুদ্ধ করিয়া চিঠি লিখিতে বসিল। অপূর্ব্ব তাহাকে যে সোণালি পাড়-দেওয়া রঙীন্ কাগজ দিয়াছিল তাহাই বাহির করিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল। খুব যত্ন করিয়া ধরিয়া লাইন বাঁকা করিয়া অঙ্গুলিতে কালি মাখিয়া অক্ষর ছোট বড় করিয়া উপরে কোন সম্বোধন না করিয়া একেবারে লিখিল—তুমি আমাকে চিঠি লেখ না কেন। তুমি কেমন আছ আর তুমি বাড়ি এস। আর কি বলিবার আছে কিছুই ভাবিয়া পাইল না। আসল বক্তব্য কথা সব গুলিই বলা হইয়া গেল বটে, কিন্তু মনুষ্যসমাজে মনের ভাব আর একটু বাহুল্য করিয়া প্রকাশ করা আবশ্যক। মৃণ্ময়ীও তাহা বুঝিল; এই জন্য আরো অনেকক্ষণ ভাবিয়া ভাবিয়া আর কয়েকটি নূতন কথা যোগ করিয়া দিল—এইবার তুমি আমাকে চিঠি লিখো, আর কেমন আছ লিখো, আর বাড়ি এস, মা ভাল আছেন বিশু পুঁটি ভাল আছে, কাল আমাদের কালোগরুর বাছুর হয়েছে।—এই বলিয়া চিঠি শেষ করিল। চিঠি লেফাফায় মুড়িয়া প্রত্যেক অক্ষরটির উপর একটি ফোঁটা করিয়া মনের ভালবাসা দিয়া লিখিল শ্রীযুক্ত বাবু অপূর্ব্বকৃষ্ট রায়। ভালবাসা যতই দিক, তবু লাইন সোজা, অক্ষর সুছাঁদ এবং বানান শুদ্ধ হইল না।

লেফাফায় নামটুকু ব্যতীত আরো যে কিছু লেখা আব-

শুক মৃণ্ময়ীর তাহা জানা ছিল না। পাছে শাশুড়ি অথবা আর কাহারো দৃষ্টিপথে পড়ে সেই লজ্জায় চিঠিখানি একটি বিশ্বস্ত দাসীর হাত দিয়া ডাকে পাঠাইয়া দিল।

বলা বাহুল্য, এ পত্রের কোন ফল হইল না, অপূর্ব্ব বাড়ি আসিল না।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

মা দেখিলেন ছুটি হইল তবু অপূর্ব্ব বাড়ি আসিল না। মনে করিলেন এখনো সে তাঁহার উপর রাগ করিয়া আছে।

মৃণ্ময়ীও স্থির করিল অপূর্ব্ব তাহার উপর বিরক্ত হইয়া আছে। তখন আপনার চিঠিখানি মনে করিয়া সে লজ্জায় মরিয়া যাইতে লাগিল। সে চিঠিখানা যে কত তুচ্ছ, তাহাতে যে কোন কথাই লেখা হয় নাই, তাহার মনের ভাব যে কিছুই প্রকাশ হয় নাই, সেটা পাঠ করিয়া অপূর্ব্ব যে মৃণ্ময়ীকে আরো ছেলেমানুষ মনে করিতেছে, মনে মনে আরো অবজ্ঞা করিতেছে, ইহা ভাবিয়া সে শরবিদ্ধের ন্যায় অন্তরে অন্তরে ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিল। দাসীকে বারবার করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "সে চিঠিখানা তুই কি ডাকে দিয়ে এসেছিস্?" দাসী তাহাকে সহস্রবার আশ্বাস দিয়া কহিল "হাঁগো, আমি নিজের হাতে বাক্সের মধ্যে ফেলে দিয়েছি। বাবু সে এত দিনে কোন্ কালে পেয়েছে।"

অবশেষে অপূর্ব্বর মা একদিন মৃণ্ময়ীকে ডাকিয়া কহিলেন, "বৌমা, অপূ্ অনেক দিন ত বাড়ি এল না, তাই মনে করচি একবার কলকাতায় গিয়ে তাকে দেখে' আসি গে। তুমি সঙ্গে যাবে?" মৃণ্ময়ী সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়িল এবং ঘরের মধ্যে আসিয়া দ্বাররুদ্ধ করিয়া বিছানার উপর পড়িয়া বালিশখানা বুকের উপর চাপিয়া ধরিয়া হাসিয়া নড়িয়া চড়িয়া মনের আবেগ উন্মুক্ত করিয়া দিল; তাহার পর ক্রমে গম্ভীর হইয়া বিষণ্ণ হইয়া আশঙ্কায় পরিপূর্ণ হইয়া বসিয়া কাঁদিতে লাগিল।

অপূর্ব্বকে কোন খবর না দিয়া এই দুটি অনুতপ্তা রমণী তাহার প্রসন্নতা ভিক্ষা করিবার জন্য কলিকাতায় যাত্রা করিল। অপূর্ব্বর মা সেখানে তাঁহার জামাইবাড়িতে গিয়া উঠিলেন।

সেদিন মৃণ্ময়ীর পত্রের প্রত্যাশায় নিরাশ হইয়া সন্ধ্যাবেলায় অপূর্ব্ব প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়া নিজেই তাহাকে পত্র লিখিতে বসিয়াছে। কোন কথাই পছন্দমত হইতেছে না। এমন একটা সম্বোধন খুঁজিতেছে যাহাতে ভালবাসাও প্রকাশ হয় অথচ অভিমানও ব্যক্ত করে; কথা না পাইয়া মাতৃভাষার উপর অশ্রদ্ধা দৃঢ়তর হইতেছে। এমন সময় ভগ্নীপতির নিকট হইতে পত্র পাইল, মা আসিয়াছেন, শীঘ্র আসিবে এবং রাত্রে এইখানেই আহারাদি করিবে। সংবাদ সমস্ত ভাল।—শেষ আশ্বাসসত্ত্বেও অপূর্ব্ব অমঙ্গলশঙ্কায় বিমর্ষ হইয়া উঠিল। অবিলম্বে ভগ্নীর বাড়ি গিয়া উপস্থিত হইল।

সাক্ষাৎমাত্রই মাকে জিজ্ঞাসা করিল, "মা, সব ভাল ত?" মা কহিলেন, "সব ভাল। তুই ছুটিতে বাড়ি গেলি না, তাই আমি তোকে নিতে এসেচি।"

অপূর্ব্ব কহিল, সে জন্য এত কষ্ট করিয়া আসিবার কি আবশ্যক ছিল; আইন পরীক্ষার পড়াশুনা ইত্যাদি ইত্যাদি।

আহারের সময় ভগ্নী জিজ্ঞাসা করিল, দাদা এবার বৌকে তোমার সঙ্গে আন্‌লে না কেন?

দাদা গম্ভীরভাবে কহিতে লাগিল—আইনের পড়াশুনা ইত্যাদি।

ভগ্নীপতি হাসিয়া কহিল—ও সমস্ত মিথ্যা ওজর! আমাদের ভয়ে আন্‌তে সাহস হয় না!

ভগ্নী কহিল, ভয়ঙ্কর লোকটাই বটে! ছেলেমানুষ হঠাৎ দেখ্‌লে আচম্‌কা আঁৎকে উঠ্‌তে পারে!

এই ভাবে হাস্য পরিহাস চলিতে লাগিল, কিন্তু অপূর্ব্ব অত্যন্ত বিমর্ষ হইয়া রহিল। কোন কথা তাহার ভাল লাগিতেছিল না। তাহার মনে হইতেছিল, সেই যখন মা কলিকাতায় আসিলেন তখন মৃণ্ময়ী ইচ্ছা করিলে অনায়াসে তাঁহার সহিত আসিতে পারিত। বোধ হয় মা তাহাকে সঙ্গে আনিবার চেষ্টাও করিয়াছিলেন কিন্তু সে সম্মত হয় নাই। এ সম্বন্ধে সঙ্কোচবশতঃ মাকে কোন প্রশ্ন করিতে পারিল না—সমস্ত মানবজীবন এবং বিশ্বরচনাটা আগাগোড়া ভ্রান্তিসঙ্কুল বলিয়া বোধ হইল।

আহারান্তে প্রবলবেগে বাতাস উঠিয়া বিষম বৃষ্টি আরম্ভ হইল।

ভগ্নী কহিল, দাদা, আজ আমাদের এখানেই থেকে যাও।

দাদা কহিল, না বাড়ি যেতে হবে; কাজ আছে।

ভগ্নীপতি কহিল, রাত্রে তোমার আবার এত কাজ কিসের? এখানে একরাত্রি থেকে গেলে তোমার ত কারো কাছে জবাবদিহি করতে হবে না, তোমার ভাবনা কি?

অনেক পীড়াপীড়ির পর বিস্তর অনিচ্ছাসত্ত্বে অপূর্ব্ব সে রাত্রি থাকিয়া যাইতে সম্মত হইল।

ভগ্নী কহিল, দাদা তোমাকে শ্রান্ত দেখাচ্চে, তুমি আর দেরি কোরো না, চল শুতে চল।

অপূর্ব্বরও সেই ইচ্ছা। শয্যাতলে অন্ধকারের মধ্যে একলা হইতে পারিলে বাঁচে, কথার উত্তর প্রত্যুত্তর করিতে ভাল লাগিতেছে না।

শয়নগৃহের দ্বারে আসিয়া দেখিল ঘর অন্ধকার। ভগ্নী কহিল, বাতাসে আলো নিবে গেছে দেখ্‌চি, তা আলো এনে দেব কি দাদা?

অপূর্ব্ব কহিল, না দরকার নেই, আমি রাত্রে আলো রাখিনে।

ভগ্নী চলিয়া গেলে অপূর্ব্ব অন্ধকারে সাবধানে খাটের অভিমুখে গেল।

খাটে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইতেছে এমন সময় হঠাৎ

বলয়নিক্বণশব্দে একটি সুকোমল বাহুপাশ তাহাকে সুকঠিন বন্ধনে বাঁধিয়া ফেলিল এবং একটি পুষ্পপুটতুল্য ওষ্ঠাধর দস্যুর মত আসিয়া পড়িয়া অবিরল অশ্রুজলসিক্ত আবেগপূর্ণ চুম্বনে তাহাকে বিস্ময় প্রকাশের অবসর দিল না। অপূর্ব্ব প্রথমে চমকিয়া উঠিল তাহার পর বুঝিতে পারিল অনেক দিনের একটি হাস্যবাধায় অসম্পন্ন চেষ্টা আজ অশ্রুজলধারায় সমাপ্ত হইল।

মেঘ ও রৌদ্র।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

পূর্ব্বদিনে বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। আজ ক্ষান্তবর্ষণ প্রাতঃকালে ম্লান রৌদ্র এবং খণ্ড মেঘে মিলিয়া পরিপক্কপ্রায় আউষ ধানের ক্ষেত্রের উপর পর্য্যায়ক্রমে আপন আপন সুদীর্ঘ তুলি বুলাইয়া যাইতেছিল; সুবিস্তীর্ণ শ্যাম চিত্রপট একবার আলোকের স্পর্শে উজ্জ্বল পাণ্ডুবর্ণ ধারণ করিতেছিল আবার পরক্ষণেই ছায়া-প্রলেপে গাঢ় স্নিগ্ধতায় অঙ্কিত হইতেছিল।

যখন সমস্ত আকাশ-রঙ্গভূমিতে মেঘ এবং রৌদ্র, দুইটি মাত্র অভিনেতা, আপন আপন অংশ অভিনয় করিতেছিল, তখন নিম্নে সংসার রঙ্গভূমিতে কত স্থানে কত অভিনয় চলিতেছিল তাহার আর সংখ্যা নাই।

আমরা যেখানে একটি ক্ষুদ্র জীবননাট্যের পট উত্তোলন করিলাম সেখানে গ্রামে পথের ধারে একটি বাড়ি দেখা যাইতেছে। বাহিরের একটিমাত্র ঘর পাকা, এবং সেই ঘরের দুই পার্শ্ব দিয়া জীর্ণপ্রায় ইষ্টকের প্রাচীর গুটিকতক মাটির ঘর বেষ্টন করিয়া আছে। পথ হইতে গরাদের জান্‌লা দিয়া দেখা যাইতেছে একটি যুবা পুরুষ খালি গায়ে তক্তপোষে বসিয়া বামহস্তে ক্ষণেক্ষণে তালপাতার পাখা লইয়া গ্রীষ্ম এবং মশক

দূর করিবার চেষ্টা করিতেছেন এবং দক্ষিণ হস্তে বই লইয়া পাঠে নিবিষ্ট আছেন।

বাহিরে গ্রামের পথে একটি ডুরে-কাপড়-পরা বালিকা আঁচলে গুটিকতক কালো জাম লইয়া একে একে নিঃশেষ করিতে করিতে উক্ত গরাদে-দেওয়া জানলার সম্মুখ দিয়া বারম্বার যাতায়াত করিতেছিল। মুখের ভাবে স্পষ্টই বোঝা যাইতেছিল ভিতরে যে মানুষটি তক্তপোষে বসিয়া বই পড়িতেছে তাহার সহিত বালিকার ঘনিষ্ঠ পরিচয় আছে—এবং কোন মতে সে তাহার মনোযোগ আকর্ষণ পূর্ব্বক তাহাকে নীরবে অবজ্ঞাভরে জানাইয়া যাইতে চাহে যে, সম্প্রতি কালো-জাম খাইতে আমি অত্যন্ত ব্যস্ত আছি, তোমাকে আমি গ্রাহ্যমাত্র করি না।

দুর্ভাগ্যক্রমে, ঘরের ভিতরকার অধ্যয়নশীল পুরুষটি চক্ষে কম দেখেন, দূর হইতে বালিকার নীরব উপেক্ষা তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। বালিকাও তাহা জানিত, সুতরাং অনেক ক্ষণ নিষ্ফল আনাগোনার পর নীরব উপেক্ষার পরিবর্ত্তে কালোজামের আঁটি ব্যবহার করিতে হইল। অন্ধের নিকটে অভিমানের বিশুদ্ধতা রক্ষা করা এতই দুরূহ।

যখন ক্ষণে ক্ষণে দুই চারিটা কঠিন আঁটি যেন দৈবক্রমে বিক্ষিপ্ত হইয়া কাঠের দরজার উপর ঠক্ করিয়া শব্দ করিয়া উঠিল তখন পাঠরত পুরুষটি মাথা তুলিয়া চাহিয়া দেখিল। মায়াবিনী বালিকা তাহা জানিতে পারিয়া দ্বিগুণ নিবিষ্ট-

ভাবে অঞ্চল হইতে দংশনযোগ্য সুপক্ক কালোজাম নির্ব্বাচন করিতে প্রবৃত্ত হইল। পুরুষটি ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বিশেষ চেষ্টাসহকারে নিরীক্ষণপূর্ব্বক বালিকাকে চিনিতে পারিল এবং বই রাখিয়া জানলার কাছে উঠিয়া দাঁড়াইয়া হাস্যমুখে ডাকিল—গিরিবালা!

গিরিবালা অবিচলিতভাবে নিজের অঞ্চলের মধ্যে জাম পরীক্ষাকার্য্যে সম্পূর্ণ অভিনিবিষ্ট থাকিয়া মৃদুগমনে আপনমনে এক এক পা করিয়া চলিতে লাগিল।

তখন ক্ষীণদৃষ্টি যুবা পুরুষের বুঝিতে বাকি রহিল না, যে, কোন একটি অজ্ঞানকৃত অপরাধের দণ্ডবিধান হইতেছে। তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিয়া কহিলেন—"কই, আজ আমাকে জাম দিলে না?" গিরিবালা সে কথা কানে না আনিয়া বহু অন্বেষণ ও পরীক্ষায় একটি জাম মনোনীত করিয়া অত্যন্ত নিশ্চিন্ত মনে খাইতে আরম্ভ করিল।

এই জামগুলি গিরিবালাদের বাগানের জাম এবং যুবা পুরুষের দৈনিক বরাদ্দ। কি জানি, সে কথা কিছুতেই আজ গিরিবালার স্মরণ হইল না। তাহার ব্যবহারে প্রকাশ পাইল যে এগুলি সে একমাত্র নিজের জন্যই আহরণ করিয়াছে। কিন্তু নিজের বাগান হইতে ফল পাড়িয়া পরের দরজার সম্মুখে আসিয়া ঘটা করিয়া খাইবার কি অর্থ পরিষ্কার বুঝা গেল না। তখন পুরুষটি কাছে আসিয়া তাহার হাত ধরিল। গিরিবালা প্রথমটা আঁকিয়া বাঁকিয়া হাত ছাড়াইয়া চলিয়া যাইবার চেষ্টা

করিল, তাহার পরে সহসা অশ্রুজলে ভাসিয়া কাঁদিয়া উঠিল, এবং আঁচলের জাম ভূতলে ছড়াইয়া ফেলিয়া দিয়া ছুটিয়া চলিয়া গেল।

সকালবেলাকার চঞ্চল রৌদ্র এবং চঞ্চল মেঘ বৈকালে শান্ত ও শ্রান্ত ভাব ধারণ করিয়াছে;—শুভ্র স্ফীত মেঘ আকাশের প্রান্তভাগে স্তূপাকার হইয়া পড়িয়া আছে এবং অপরাহ্নের অবসন্নপ্রায় আলোক গাছের পাতায় পুষ্করিণীর জলে এবং বর্ষাস্নাত প্রকৃতির প্রত্যেক অঙ্গে প্রত্যঙ্গে ঝিক্‌ঝিক্ করিতেছে। আবার সেই বালিকাটিকে সেই গরাদের জানলার সম্মুখে দেখা যাইতেছে এবং ঘরের মধ্যে সেই যুবা পুরুষটি বসিয়া আছে। প্রভেদের মধ্যে, এ বেলা বালিকার অঞ্চলে জাম নাই এবং যুবকের হস্তেও বই নাই। তদপেক্ষা গুরুতর এবং নিগূঢ় প্রভেদও কিছু কিছু ছিল।

এবেলাও বালিকা কি বিশেষ আবশ্যকে সেই বিশেষ স্থানে আসিয়া ইতস্ততঃ করিতেছে বলা কঠিন। আর যাহাই আবশ্যক থাক্ ঘরের ভিতরকার মানুষটির সহিত আলাপ করিবার যে আবশ্যক আছে ইহা কোন মতেই বালিকার ব্যবহারে প্রকাশ পায় না। বরঞ্চ বোধ হইল সে দেখিতে আসিয়াছে সকাল বেলায় যে জামগুলা ফেলিয়া গেছে বিকাল বেলায় তাহার কোনটার অঙ্কুর বাহির হইয়াছে কি না।

কিন্তু অঙ্কুর না বাহির হইবার অন্যান্য কারণের মধ্যে একটি গুরুতর কারণ এই ছিল যে, ফলগুলি সম্প্রতি যুবকের

সম্মুখে তক্তপোষের উপরে রাশীকৃত ছিল; এবং বালিকা যখন ক্ষণে ক্ষণে অবনত হইয়া কোন একটা অনির্দ্দেশ্য কাল্পনিক পদার্থের অনুসন্ধানে নিযুক্ত ছিল তখন যুবক মনের হাস্য গোপন করিয়া অত্যন্ত গম্ভীর ভাবে একটি একটি জাম নির্ব্বাচন করিয়া সযত্নে আহার করিতে ছিল। অবশেষে যখন দুটো একটা আঁটি দৈবক্রমে বালিকার পায়ের কাছে, এমন কি, গায়ের উপরে আসিয়া পড়িল তখন গিরিবালা বুঝিতে পারিল যুবক বালিকার অভিমানের প্রতিশোধ লইতেছে। কিন্তু এই কি উচিত! যখন সে আপনার ক্ষুদ্র হৃদয়টুকুর সমস্ত গর্ব্ব বিসর্জ্জন দিয়া আত্মসমর্পণ করিবার অবসর খুজিতেছে তখন কি তাহার সেই অত্যন্ত দুরূহ পথে বাধা দেওয়া নিষ্ঠুরতা নহে? ধরা দিতে আসিয়াছে এই কথাটা ধরা পড়িয়া বালিকা যখন ক্রমশঃ আরক্তিম হইয়া পলায়নের পথ অনুসন্ধান করিতে লাগিল তখন যুবক বাহিরে আসিয়া তাহার হাত ধরিল।

সকালবেলাকার মত এবেলাও বালিকা আঁকিয়া বাঁকিয়া হাত ছাড়াইয়া পালাইবার বহু চেষ্টা করিল—কিন্তু কাঁদিল না। বরঞ্চ রক্তবর্ণ হইয়া ঘাড় বাঁকাইয়া উৎপীড়নকারীর পৃষ্ঠদেশে মুখ লুকাইয়া প্রচুর পরিমাণে হাসিতে লাগিল এবং যেন কেবলমাত্র বাহু আকর্ষণে নীত হইয়া পরাভূত বন্দীভাবে লৌহগরাদে বেষ্টিত কারাগারের মধ্যে প্রবেশ করিল।

আকাশে মেঘ রৌদ্রের খেলা যেমন সামান্য, ধরাপ্রান্তে

এই দুটি প্রাণীর খেলাও তেম্‌নি সামান্য তেম্‌নি ক্ষণস্থায়ী। আবার, আকাশে মেঘ রৌদ্রের খেলা যেমন সামান্য নহে এবং খেলা নহে কিন্তু খেলার মত দেখিতে মাত্র, তেম্‌নি এই দুটি অখ্যাতনামা মনুষ্যের একটি কর্ম্মহীন বর্ষাদিনের ক্ষুদ্র ইতিহাস সংসারের শত শত ঘটনার মধ্যে তুচ্ছ বলিয়া প্রতীয়মান হইতে পারে কিন্তু ইহা তুচ্ছ নহে। যে বৃদ্ধ বিরাট অদৃষ্ট অবিচলিত গম্ভীর মুখে অনন্তকাল ধরিয়া যুগের সহিত যুগান্তর গাঁথিয়া তুলিতেছে, সেই বৃদ্ধই বালিকার এই সকাল বিকালের তুচ্ছ হাসিকান্নার মধ্যে জীবনব্যাপী সুখ দুঃখের বীজ অঙ্কুরিত করিয়া তুলিতেছিল। তথাপি বালিকার এই অকারণ অভিমান বড়ই অর্থহীন বলিয়া বোধ হইল। কেবল দর্শকের কাছে নহে, এই ক্ষুদ্র নাট্যের প্রধান পাত্র উক্ত যুবকের নিকটেও। এ বালিকা কেন যে এক দিন বা রাগ করে, একদিন বা অপরিমিত স্নেহ প্রকাশ করিতে থাকে—কোন দিন বা দৈনিক বরাদ্দ বাড়াইয়া দেয়, কোন দিন বা দৈনিক বরাদ্দ একেবারেই বন্ধ করে, তাহার কারণ খুঁজিয়া পাওয়া সহজ নহে। এক এক দিন সে যেন তাহার সমস্ত কল্পনা ভাবনা এবং নৈপুণ্য একত্র করিয়া যুবকের সন্তোষসাধনে প্রবৃত্ত হয়, আবার এক একদিন তাহার সমস্ত ক্ষুদ্র শক্তি তাহার সমস্ত কাঠিন্য একত্র সংহত করিয়া তাঁহাকে আঘাত করিতে চেষ্টা করে। বেদনা দিতে না পারিলে তাহার কাঠিন্য দ্বিগুণ বাড়িয়া উঠে; কৃতকার্য্য হইলে সে কাঠিন্য অনুতাপের

অশ্রুজলে শতধা বিগলিত হইয়া অজস্র স্নেহ-ধারায় প্রবাহিত হইতে থাকে।

এই তুচ্ছ মেঘরৌদ্র খেলার প্রথম তুচ্ছ ইতিহাস পর-পরিচ্ছেদে সংক্ষেপে বিবৃত করা যাইতেছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

গ্রামের মধ্যে আর সকলেই দলাদলি, চক্রান্ত, ইক্ষুর চাষ, মিথ্যা মকদ্দমা এবং পাটের কারবার লইয়া থাকিত, ভাবের আলোচনা এবং সাহিত্য চর্চ্চা করিতে কেবল শশিভূষণ এবং গিরিবালা।

ইহাতে কাহারো ঔৎসুক্য বা উৎকণ্ঠার কোন বিষয় নাই। কারণ গিরিবালার বয়স দশ এবং শশিভূষণ একটি সদ্য বিকশিত এমে, বিএল।* উভয়ে প্রতিবেশী মাত্র।

গিরিবালার পিতা হরকুমার এককালে নিজগ্রামের পত্তনীদার ছিলেন। এখন দুরবস্থায় পড়িয়া সমস্ত বিক্রয় করিয়া তাঁহাদের বিদেশী জমিদারের নায়েবী পদগ্রহণ করিয়াছেন। যে পরগনায় তাঁহাদের বাস সেই পরগনারই নায়েবী সুতরাং তাঁহাকে জন্মস্থান হইতে নড়িতে হয় না।

শশিভূষণ এম, এ পাশ করিয়া আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন কিন্তু কিছুতেই কোন কর্ম্মে ভিড়িলেন না।

লোকের সঙ্গে মেশা বা সভাস্থলে দুটো কথা বলা সেও তাঁহার দ্বারা হইয়া উঠে না। চোখে কম দেখেন বলিয়া চেনা লোককে চিনিতে পারেন না এবং সেই কারণেই ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া দৃষ্টিপাত করিতে হয়, লোকে সেটাকে ঔদ্ধত্য বলিয়া বিবেচনা করে।

কলিকাতায় জনসমুদ্রের মধ্যে আপন মনে একলা থাকা শোভা পায় কিন্তু পল্লিগ্রামে সেটা বিশেষ স্পর্দ্ধার মত দেখিতে হয়। শশিভূষণের বাপ যখন বিস্তর চেষ্টায় পরাস্ত হইয়া অবশেষে তাঁহার অকর্ম্মণ্য পুত্রটিকে পল্লীতে তাঁহাদের সামান্য বিষয়রক্ষাকার্য্যে নিয়োগ করিলেন তখন শশিভূষণকে পল্লী-বাসীদের নিকট হইতে বিস্তর উৎপীড়ন, উপহাস এবং লাঞ্ছনা সহিতে হইয়াছিল। লাঞ্ছনার আরও একটা কারণ ছিল; শান্তিপ্রিয় শশিভূষণ বিবাহ করিতে সম্মত ছিলেন না—কন্যাদায়গ্রস্ত পিতামাতাগণ তাঁহার এই অনিচ্ছাকে দুঃসহ অহঙ্কার জ্ঞান করিয়া কিছুতেই ক্ষমা করিতে পারিতেন না।

শশিভূষণের উপর যতই উপদ্রব হইতে লাগিল শশিভূষণ ততই আপন বিবরের মধ্যে অদৃশ্য হইতে লাগিলেন। একটি কোণের ঘরে তক্তপোষের উপর কতকগুলি বাঁধানো ইংরাজি বই লইয়া বসিয়া থাকিতেন—যখন যেটা ইচ্ছা হইত পাঠ করিতেন, এই ত ছিল তাঁহার কাজ বিষয় কি করিয়া রক্ষা হইত তাহা বিষয়ই জানে।

এবং পূর্ব্বেই আভাসে বলা গিয়াছে মানুষের মধ্যে তাঁহার সম্পর্ক ছিল কেবল গিরিবালার সহিত।

গিরিবালার ভাইরা ইস্কুলে যাইত এবং ফিরিয়া আসিয়া মূঢ় ভগ্নীটিকে কোন দিন জিজ্ঞাসা করিত পৃথিবীর আকার কিরূপ, কোন দিন বা প্রশ্ন করিত সূর্য্য বড় না পৃথিবী বড়, সে যখন ভুল বলিত তখন তাহার প্রতি বিপুল অবজ্ঞা দেখাইয়া ভ্রম সংশোধন করিত। সূর্য্য পৃথিবী অপেক্ষা বৃহৎ এ মতটা যদি গিরিবালার নিকট প্রমাণাভাবে অসিদ্ধ বলিয়া বোধ হইত এবং সেই সন্দেহ যদি সে সাহস করিয়া প্রকাশ করিত, তবে তাহার ভাইরা তাহাকে দ্বিগুণ উপেক্ষাভরে কহিত "ইস্! আমাদের বইয়ে লেখা আছে আর তুই—"

ছাপার বইয়ে এমন কথা লেখা আছে শুনিয়া গিরিবালা সম্পূর্ণ নিরুত্তর হইয়া যাইত দ্বিতীয় আর কোন প্রমাণ তাহার নিকট আবশ্যক বোধ হইত না।

কিন্তু তাহার মনে মনে বড় ইচ্ছা করিত সেও দাদা-দের মত বই লইয়া পড়ে। কোন কোন দিন সে আপন ঘরে বসিয়া কোন একটা বই খুলিয়া বিড়বিড় করিয়া পড়ার ভান করিত এবং অনর্গল পাতা উল্টাইয়া যাইত। ছাপার কালো কালো ছোট ছোট অপরিচিত অক্ষরগুলি কি যেন এক মহারহস্যশালার সিংহদ্বারে দলে দলে সার বাঁধিয়া স্কন্ধের উপরে ইকার ঐকার রেফ উঁচাইয়া পাহারা দিত, গিরিবালার কোন প্রশ্নের কোনই উত্তর করিত না। কথা-

মালা তাহার ব্যাঘ্র শৃগাল অশ্বগর্দ্দভের একটি কথাও কৌতূহলকাতর বালিকার নিকট ফাঁস করিত না এবং আখ্যানমঞ্জরী তাহার সমস্ত আখ্যানগুলি লইয়া মৌনব্রতের মত নীরবে চাহিয়া থাকিত।

গিরিবালা তাহার ভাইদের নিকট পড়া শিখিবার প্রস্তাব করিয়াছিল কিন্তু তাহার ভাইরা সে কথায় কর্ণপাতমাত্র করে নাই। একমাত্র শশিভূষণ তাহার সহায় ছিল।

গিরিবালার নিকট কথামালা এবং আখ্যানমঞ্জরী যেমন দুর্ভেদ্য রহস্যপূর্ণ ছিল শশিভূষণও প্রথম প্রথম অনেকটা সেইরূপ ছিল। লোহার গরাদে দেওয়া রাস্তার ধারের ছোট বসিবার ঘরটিতে যুবক একাকী তক্তপোষের উপর পুস্তকে পরিবৃত হইয়া বসিয়া থাকিত; গিরিবালা গরাদে ধরিয়া বাহিরে দাঁড়াইয়া অবাক্ হইয়া এই নতপৃষ্ঠ পাঠ-নিবিষ্ট অদ্ভুত লোকটিকে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিত; পুস্তকের সংখ্যা তুলনা করিয়া মনে মনে স্থির করিত শশিভূষণ তাহার ভাইদের অপেক্ষা অনেক বেশি বিদ্বান। তদপেক্ষা বিস্ময়জনক ব্যাপার তাহার নিকট আর কিছুই ছিল না। কথামালা প্রভৃতি পৃথিবীর প্রধান প্রধান পাঠ্যপুস্তকগুলি শশিভূষণ যে নিঃশেষপূর্ব্বক পাঠ করিয়া ফেলিয়াছে এবিষয়ে তাহার সন্দেহমাত্র ছিল না। এই জন্য, শশিভূষণ যখন পুস্তকের পাত ওল্টাইত সে স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া তাহার জ্ঞানের অবধি নির্ণয় করিতে পারিত না।

অবশেষে এই বিস্ময়মগ্ন বালিকাটি ক্ষীণদৃষ্টি শশিভূষণেরও মনোযোগ আকর্ষণ করিল। শশিভূষণ একদিন একটা ঝক-ঝকে বাঁধানো বই খুলিয়া বলিল—গিরিবালা ছবি দেখ্‌বি আয়। গিরিবালা তৎক্ষণাৎ দৌড়িয়া পালাইয়া গেল।

কিন্তু পরদিন সে পুনর্ব্বার ডুরে কাপড় পরিয়া সেই গরাদের বাহিরে দাঁড়াইয়া সেইরূপ গম্ভীর মৌন মনোযোগের সহিত শশিভূষণের অধ্যয়ন কার্য্য নিরীক্ষণ করিয়া দেখিতে লাগিল। শশিভূষণ সেদিনও ডাকিল এবং সেদিনও সে বেণী দুলাইয়া উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া পালাইল।

এইরূপে তাহাদের পরিচয়ের সূত্রপাত হইয়া ক্রমে কখন্ ঘনিষ্ঠতর হইয়া উঠিল এবং কখন যে বালিকা গরাদের বাহির হইতে শশিভূষণের ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল, তাহার তক্ত-পোষের উপর বাঁধানো পুস্তকস্তূপের মধ্যে স্থান পাইল ঠিক সে তারিখটা নির্ণয় করিয়া দিতে ঐতিহাসিক গবেষণার আবশ্যক।

শশিভূষণের নিকট গিরিবালার লেখাপড়ার চর্চ্চা আরম্ভ হইল। শুনিয়া সকলে হাসিবেন, এই মাষ্টারটি তাহার ক্ষুদ্র ছাত্রীকে কেবল যে অক্ষর, বানান এবং ব্যাকরণ শিখাইত তাহা নহে—অনেক বড় বড় কাব্য তর্জ্জমা করিয়া শুনাইত এবং তাহার মতামত জিজ্ঞাসা করিত। বালিকা কি বুঝিত তাহা অন্তর্যামীই জানেন, কিন্তু তাহার ভাল লাগিত তাহাতে সন্দেহ নাই। সে বোঝা না-বোঝায় মিশাইয়া আপন বাল্য-

হৃদয়ে নানা অপরূপ কল্পনাচিত্র আঁকিয়া লইত। নীরবে চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া মন দিয়া শুনিত, মাঝে মাঝে এক একটা অত্যন্ত অসঙ্গত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিত এবং কখন কখন অকস্মাৎ একটা অসংলগ্ন প্রসঙ্গান্তরে গিয়াও উপনীত হইত। শশিভূষণ তাহাতে কখনো কিছু বাধা দিত না—বড় বড় কাব্য সম্বন্ধে এই অতি ক্ষুদ্র সমালোচকের নিন্দা প্রশংসা টীকা ভাষ্য শুনিয়া সে বিশেষ আনন্দ লাভ করিত। সমস্ত পল্লীর মধ্যে এই গিরিবালাই তাহার একমাত্র সমজদার বন্ধু।

গিরিবালার সহিত শশিভূষণের প্রথম পরিচয় যখন, তখন গিরির বয়স আট ছিল, এখন তাহার বয়স দশ হইয়াছে। এই দুই বৎসরে সে ইংরাজি ও বাঙ্গলা বর্ণমালা শিখিয়া দুই চারিটা সহজ বই পড়িয়া ফেলিয়াছে। এবং শশিভূষণের পক্ষেও পল্লিগ্রাম এই দুই বৎসর নিতান্ত সঙ্গবিহীন বিরস বলিয়া বোধ হয় নাই।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

কিন্তু গিরিবালার বাপ হরকুমারের সহিত শশিভূষণের ভালরূপ বনিবনাও হয় নাই। হরকুমার প্রথম প্রথম এই এম্ এ, বি, এলের নিকট মকদ্দমা মাম্‌লা সম্বন্ধে পরামর্শ লইতে আসিত; এম্ এ বি এল্ তাহাতে বড় একটা মনোযোগ

করিত না, এবং আইন বিদ্যা সম্বন্ধে নায়েবের নিকট আপন অজ্ঞতা স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হইত না। নায়েব সেটাকে নিতান্তই ছল মনে করিত। এমন ভাবে বছর দুয়েক কাটিল।

সম্প্রতি একটি অবাধ্য প্রজাকে শাসন করা আবশ্যক হইয়াছে। নায়েব মহাশয় তাহার নামে ভিন্ন ভিন্ন জেলায় ভিন্ন ভিন্ন অপরাধ ও দাবীতে নালিষ রুজু করিয়া দিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া পরামর্শের জন্য শশিভূষণকে কিছু বিশেষ পীড়াপীড়ি করিয়া ধরিলেন। শশিভূষণ পরামর্শ দেওয়া দূরে থাক্ শান্ত অথচ দৃঢ়ভাবে হরকুমারকে এমন গুটি দুই চারি কথা বলিলেন, যাহা তাহার কিছুমাত্র মিষ্ট বোধ হইল না।

এদিকে আবার প্রজার নামে একটি মকদ্দমাতেও হরকুমার জিতিতে পারিলেন না। তাঁহার মনে দৃঢ় ধারণা হইল শশিভূষণ উক্ত হতভাগ্য প্রজার সহায় ছিল। তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন এমন লোককে গ্রাম হইতে অবিলম্বে তাড়াইতে হইবে।

শশিভূষণ দেখিলেন তাঁহার ক্ষেতের মধ্যে গোরু প্রবেশ করে, তাঁহার কলাইয়ের খোলায় আগুন লাগিয়া যায়, তাঁহার সীমানা লইয়া বিবাদ বাধে, তাঁহার প্রজারা সহজে খাজনা দেয় না এবং উল্টিয়া তাঁহার নামে মিথ্যা মকদ্দমা আনিবার উপক্রম করে, এমন কি, সন্ধ্যার সময় পথে বাহির হইলে তাঁহাকে মারিবে এবং রাত্রে তাঁহার বসত বাটীতে আগুন লাগাইয়া দিবে এমন সকল জনশ্রুতিও শোনা যাইতে লাগিল।

অবশেষে শান্তিপ্রিয় নিরীহপ্রকৃতি শশিভূষণ গ্রাম ছাড়িয়া কলিকাতায় পালাইবার আয়োজন করিলেন।

যাত্রার উদ্যোগ করিতেছেন এমন সময়ে গ্রামে জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের তাঁবু পড়িল। বর্কন্দাজ কন্‌ষ্টেবল্ খান্‌সামা কুকুর ঘোড়া সহিস্ মেথরে সমস্ত গ্রাম চঞ্চল হইয়া উঠিল। ছেলের দল ব্যাঘ্রের অনুবর্ত্তী শৃগালের পালের ন্যায় সাহেবের আড্ডার নিকটে সশঙ্কিত কৌতূহল সহকারে ঘুরিতে লাগিল।

নায়েব মহাশয় যথারীতি আতিথ্য শিরে খরচ লিখিয়া সাহেবের মুর্গি আণ্ডা ঘৃত দুগ্ধ যোগাইতে লাগিলেন। জয়েণ্ট সাহেবের যে পরিমাণে খাদ্য আবশ্যক নায়েব মহাশয় তদপেক্ষা অনেক বেশি অক্ষুণ্ণ চিত্তে সরবরাহ করিয়াছিলেন কিন্তু প্রাতঃকালে সাহেবের মেথর আসিয়া যখন সাহেবের কুকুরের জন্য একেবারে চার সের ঘৃত আদেশ করিয়া বসিল তখন দুর্গ্রহবশতঃ সেটা তাঁহার সহ্য হইল না—মেথরকে উপদেশ দিলেন যে, সাহেবের কুত্তা যদিচ দেশি কুকুরের অপেক্ষা অনেকটা ঘি বিনা পরিতাপে হজম করিতে পারে তথাপি এতাধিক পরিমাণে স্নেহপদার্থ তাহার স্বাস্থ্যের পক্ষে কল্যাণজনক নহে। তাহাকে ঘি দিলেন না।

মেথর গিয়া সাহেবকে জানাইল যে, কুকুরের জন্য মাংস কোথায় পাওয়া যাইতে পারে ইহাই সে নায়েবের নিকট সন্ধান লইতে গিয়াছিল কিন্তু সে জাতিতে মেথর বলিয়া

নায়েব অবজ্ঞাপূর্ব্বক তাহাকে সর্ব্বলোকসমক্ষে দূর করিয়া তাড়াইয়া দিয়াছে, এমন কি সাহেবের প্রতিও উপেক্ষা প্রদর্শন করিতে কুণ্ঠিত হয় নাই।

একে ব্রাহ্মণের জাত্যভিমান সাহেব লোকের সহজেই অসহ্য বোধ হয় তাহার উপর তাঁহার মেথরকে অপমান করিতে সাহস করিয়াছে ইহাতে ধৈর্য্য রক্ষা করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিল। তৎক্ষণাৎ চাপ্‌রাসিকে আদেশ করিলেন—বোলাও নায়েবকো।

নায়েব কম্পান্বিত কলেবরে দুর্গা নাম জপ করিতে করিতে সাহেবের তাম্বুর সম্মুখে খাড়া হইলেন। সাহেব তাম্বু হইতে মচ্‌মচ্‌ শব্দে বাহির হইয়া আসিয়া নায়েবকে উচ্চ কণ্ঠে বিজাতীয় উচ্চারণে জিজ্ঞাসা করিলেন—টুমি কি কারণবশটো আমার মেঠরকে ডূর করিয়াছে?

হরকুমার শশব্যস্ত হইয়া করযোড়ে জানাইলেন, সাহেবের মেথরকে দূর করিতে পারেন এমন স্পর্দ্ধা কখনই তাঁহাতে সম্ভবে না; তবে কিনা কুকুরের জন্য একেবারে চারি সের ঘি চাহিয়া বসাতে প্রথমে তিনি উক্ত চতুষ্পদের মঙ্গলার্থে মৃদুভাবে আপত্তি প্রকাশ করিয়া পরে ঘৃত সংগ্রহ করিয়া আনিবার জন্য ভিন্ন ভিন্ন স্থানে লোক পাঠাইয়াছেন।

সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন কাহাকে পাঠানো হইয়াছে এবং কোথায় পাঠানো হইয়াছে।

হরকুমার তৎক্ষণাৎ যেমন মুখে আসিল নাম করিয়া

দিলেন। সেই সেই নামীয় লোকগণ সেই সেই গ্রামে ঘৃত আনিবার জন্য গিয়াছে কি না সন্ধান করিতে অতি সত্বর লোক পাঠাইয়া দিয়া সাহেব নায়েবকে তাম্বুতে বসাইয়া রাখিলেন।

দূতগণ অপরাহ্নে ফিরিয়া আসিয়া সাহেবকে জানাইল ঘৃত সংগ্রহের জন্য কেহ কোথাও যায় নাই। নায়েবের সমস্ত কথাই মিথ্যা এবং মেথর যে সত্য বলিয়াছে তাহাতে আর হাকিমের সন্দেহ রহিল না। তখন জয়েণ্ট সাহেব ক্রোধে গর্জ্জন করিয়া মেথরকে ডাকিয়া কহিলেন, এই শ্যালকের কর্ণ ধরিয়া তাম্বুর চারিধারে ঘোড়দৌড় করাও। মেথর আর কাল বিলম্ব না করিয়া চতুর্দ্দিকের লোকারণ্যের মধ্যে সাহেবের আদেশ পালন করিল। *

দেখিতে দেখিতে কথাটা ঘরে ঘরে রাষ্ট্র হইয়া গেল, হরকুমার গৃহে আসিয়া আহার ত্যাগ করিয়া মুমূর্যুবৎ পড়িয়া রহিলেন।

জমীদারী কার্য্য উপলক্ষে নায়েবের শত্রু বিস্তর ছিল তাহারা এই ঘটনায় অত্যন্ত আনন্দলাভ করিল কিন্তু কলিকাতায় গমনোদ্যত শশিভূষণ যখন এই সংবাদ শুনিলেন তখন

* খুলনার ম্যাজিষ্ট্রেট্ কর্ত্তৃক মুহুরি মারার বহুপূর্ব্বে এই গল্প রচিত হইয়াছে। বেল্ সাহেবের সহৃদয় বদান্যতার বৃত্তান্ত আমরা অনেক অবগত আছি, তাঁহার ন্যায় উদারপ্রকৃতি ব্যক্তির বিরুদ্ধে কটাক্ষপাত করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে।

তাঁহার সর্ব্বাঙ্গের রক্ত উত্তপ্ত হইয়া উঠিল। সমস্ত রাত্রি তাঁহার নিদ্রা হইল না।

পরদিন প্রাতে তিনি হরকুমারের বাড়িতে গিয়া উপস্থিত হইলেন, হরকুমার তাঁহার হাত ধরিয়া ব্যাকুলভাবে কাঁদিতে লাগিলেন। শশিভূষণ কহিলেন, সাহেবের নামে মানহানির মকদ্দমা আনিতে হইবে, আমি তোমার উকীল হইয়া লড়িব।

স্বয়ং ম্যাজিষ্ট্রেট্ সাহেবের নামে মকদ্দমা আনিতে হইবে শুনিয়া হরকুমার প্রথমটা ভীত হইয়া উঠিলেন—শশিভূষণ কিছুতেই ছাড়িলেন না।

হরকুমার বিবেচনা করিতে সময় লইলেন। কিন্তু যখন দেখিলেন কথাটা চারিদিকে রাষ্ট্র হইয়াছে, এবং শত্রুগণ আনন্দ প্রকাশ করিতেছে তখন তিনি আর থাকিতে পারিলেন না, শশিভূষণের শরণাপন্ন হইলেন—কহিলেন, বাপু শুনিলাম তুমি অকারণে কলিকাতায় যাইবার আয়োজন করিতেছ সে ত কিছুতেই হইতে পারিবে না। তোমার মত একজন লোক গ্রামে থাকিলে আমাদের সাহস কত থাকে। যাহা হউক আমাকে এই ঘোর অপমান হইতে উদ্ধার করিতে হইবে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

যে শশিভূষণ চিরকাল লোকচক্ষুর অন্তরালে নিভৃত নির্জ্জনতার মধ্যে আপনাকে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিয়া আসিয়াছেন

তিনি আজ আদালতে আসিয়া হাজির হইলেন। ম্যাজিষ্ট্রেট্ তাঁহার নালিশ শুনিয়া তাঁহাকে প্রাইভেট্ কাম্‌রার মধ্যে ডাকিয়া লইয়া অত্যন্ত খাতির করিয়া কহিলেন, শশিবাবু, এ মকদ্দমাটা গোপনে মিট্‌মাট্ করিয়া ফেলিলে ভাল হয় নাকি!

শশিবাবু টেবিলের উপরিস্থিত একখানি আইন গ্রন্থের মলাটের উপর তাঁহার কুঞ্চিতভ্রূ ক্ষীণদৃষ্টি অত্যন্ত নিবিষ্টভাবে রক্ষা করিয়া কহিলেন, আমার মক্কেলকে আমি এরূপ পরামর্শ দিতে পারি না। তিনি প্রকাশ্যভাবে অপমানিত হইয়াছেন, গোপনে ইহার মিট্‌মাট্ হইবে কি করিয়া।

সাহেব দুইচারি কথা কহিয়া বুঝিলেন এই স্বল্পভাষী স্বল্পদৃষ্টি লোকটিকে সহজে বিচলিত করা সম্ভব নহে, কহিলেন, অল্‌রাইট্ বাবু, দেখা যাউক কতদূর কি হয়!

এই বলিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট্ সাহেব মকদ্দমার দিন ফিরাইয়া দিয়া মফস্বল ভ্রমণে বাহির হইলেন।

এদিকে জয়েণ্ট সাহেব জমিদারকে পত্র লিখিলেন, তোমার নায়েব আমার ভৃত্যদিগকে অপমান করিয়া আমার প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করে, আশা করি তুমি ইহার সমুচিত প্রতিকার করিবে।

জমিদার শশব্যস্ত হইয়া তৎক্ষণাৎ হরকুমারকে তলব করিলেন। নায়েব আদ্যোপান্ত সমস্ত ঘটনা খুলিয়া বলিলেন। জমিদার অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া কহিলেন, সাহেবের মেথর

যখন চারিসের ঘি চাহিল তুমি বিনা বাক্যব্যয়ে তৎক্ষণাৎ কেন দিলে না? তোমার কি বাপের কড়ি লাগিত?

হরকুমার অস্বীকার করিতে পরিলেন না যে, ইহাতে তাঁহার পৈতৃক সম্পত্তির কোনরূপ ক্ষতি হইত না। অপরাধ স্বীকার করিয়া কহিলেন, আমার গ্রহ মন্দ তাই এমন দুর্ব্বুদ্ধি ঘটিয়াছিল।

জমিদার কহিলেন, তাহার পর আবার সাহেবের নামে নালিশ করিতে তোমাকে কে বলিল?

হরকুমার কহিলেন, ধর্ম্মাবতার, নালিশ করিবার ইচ্ছা আমার ছিল না; ঐ আমাদের গ্রামের শশি, তাহার কোথাও কোন মকদ্দমা জোটে না, সে ছোঁড়া নিতান্ত জোর করিয়া প্রায় আমার সম্মতি না লইয়াই এই হেঙ্গামা বাধাইয়া বসিয়াছে।

শুনিয়া জমিদার শশিভূষণের উপর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। বুঝিলেন, লোকটা অপদার্থ নব্য উকীল, কোন ছুতায় একটা হুজুক তুলিয়া সাধারণের সমক্ষে পরিচিত হইবার চেষ্টায় আছে। নায়েবকে হুকুম করিয়া দিলেন মকদ্দমা তুলিয়া লইয়া যেন অবিলম্বে ছোট বড় ম্যাজিষ্ট্রেট যুগলকে ঠাণ্ডা করা হয়।

নায়েব সাহেবের জন্য কিঞ্চিৎ ফলমূল শীতলভোগ উপহার লইয়া জয়েণ্ট্ ম্যাজিষ্ট্রেটের বাসায় গিয়া হাজির হইলেন। সাহেবকে জানাইলেন সাহেবের নামে মকদ্দমা করা

তাঁহার আদৌ স্বভাববিরুদ্ধ, কেবল শশিভূষণ নামে গ্রামের একটি অজাতশ্মশ্রু অপোগণ্ড অর্ব্বাচীন উকীল তাঁহাকে এক প্রকার না জানাইয়া এইরূপ স্পর্দ্ধার কাজ করিয়াছে। সাহেব শশিভূষণের প্রতি অত্যন্ত বিরক্ত এবং নায়েবের প্রতি বড় সন্তুষ্ট হইলেন এবং কহিলেন রাগের মাথায় নায়েব বাবুকে "ডণ্ড বিঢান" করিয়া তিনি "ডুঃ খিট্" আছেন। সাহেব বাঙ্গালা ভাষার পরীক্ষায় সম্প্রতি পুরস্কার লাভ করিয়া সাধারণের সহিত সাধুভাষায় বাক্যালাপ করিয়া থাকেন।

নায়েব কহিলেন, মা বাপ কখনো বা রাগ করিয়া শাস্তিও দিয়া থাকেন কখনও বা আদর করিয়া কোলেও টানিয়া লন, ইহাতে সন্তানের বা মা বাপের ডুঃখের কোন কারণ নাই।

অতঃপর জয়েণ্ট্ সাহেবের সমস্ত ভৃত্যবর্গকে যথাযোগ্য পারিতোষিক দিয়া হরকুমার মফস্বলে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের সহিত দেখা করিতে গেলেন। ম্যাজিষ্ট্রেট তাহার মুখে শশিভূষণের স্পর্দ্ধার কথা শুনিয়া কহিলেন, আমিও আশ্চর্য্য হইতেছিলাম যে, নায়েব বাবুকে বরাবর ভাল লোক বলিয়া জানিতাম, তিনি যে সর্ব্বাগ্রে আমাকে জানাইয়া গোপনে মিট্মাট্ না করিয়া হঠাৎ মকদ্দমা আনিবেন একি অসম্ভব ব্যাপার! এখন সমস্ত বুঝিতে পারিতেছি।

অবশেষে নায়েবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, শশি কন্‌গ্রেসে যোগ দিয়াছে কি না। নায়েব অম্লানমুখে বলিলেন হাঁ।

সাহেব তাঁহার সাহেবী বুদ্ধিতে স্পষ্টই বুঝিতে পারিলেন, এ সমস্তই কন্‌গ্রেসের চাল। একটা পাকচক্র বাধাইয়া অমৃত-বাজারে প্রবন্ধ লিখিয়া গবর্মেণ্টের সহিত খিটিমিটি করিবার জন্য কন্‌গ্রেসের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চেলাগণ লুকায়িতভাবে চতুর্দ্দিকে অবসর অনুসন্ধান করিতেছে। এই সকল ক্ষুদ্র কণ্টকগণকে একদমে দলন করিয়া ফেলিবার জন্য ম্যাজিষ্ট্রেটের হস্তে অধিকতর সরাসরি ক্ষমতা দেওয়া হয় নাই বলিয়া সাহেব ভারতবর্ষীয় গবর্মেণ্টকে অত্যন্ত দুর্ব্বল গবর্মেণ্ট বলিয়া মনে মনে ধিক্কার দিলেন। কিন্তু কন্‌গ্রেস্‌ওয়ালা শশিভূষণের নাম ম্যাজিষ্ট্রেটের মনে রহিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

সংসারে বড় বড় ব্যাপারগুলি যখন প্রবলভাবে গজাইয়া উঠিতে থাকে তখন ছোট ছোট ব্যাপারগুলিও ক্ষুধিত ক্ষুদ্র শিকড়জাল লইয়া জগতের উপর আপন দাবী বিস্তার করিতে ছাড়ে না।

শশিভূষণ যখন এই ম্যাজিষ্ট্রেটের হাঙ্গামা লইয়া বিশেষ ব্যস্ত, যখন বিস্তৃত পুঁথিপত্র হইতে আইন উদ্ধার করিতে-ছেন, মনে মনে বক্তৃতায় শান দিতেছেন, কল্পনায় সাক্ষীকে জেরা করিতে বসিয়া গিয়াছেন ও প্রকাশ্য আদালতের লোকা-রণ্য দৃশ্য এবং এই যুদ্ধপর্ব্বের ভাবী পর্ব্বাধ্যায়গুলি মনে

আনিয়া ক্ষণে ক্ষণে কম্পিত ও ঘর্ম্মাক্ত হইয়া উঠিতেছেন, তখন তাঁহার ক্ষুদ্র ছাত্রীটি তাহার ছিন্নপ্রায় চারুপাঠ ও মসীবিচিত্র লিখিবার খাতা, বাগান হইতে কখন ফুল কখন ফল, মাতৃভাণ্ডার হইতে কোন দিন আচার, কোন দিন নারিকেলের মিষ্টান্ন, কোন দিন পাতায় মোড়া কেতকী-কেশর-সুগন্ধি গৃহনির্ম্মিত খয়ের আনিয়া নিয়মিত সময়ে তাঁহার দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইত।

প্রথম দিনকতক দেখিল শশিভূষণ একখানা চিত্রহীন প্রকাণ্ড কঠোরমূর্ত্তি গ্রন্থ খুলিয়া অন্যমনস্ক ভাবে পাত উল্টাইতেছেন, সেটা যে মনোযোগ দিয়া পাঠ করিতেছেন তাহাও বোধ হইল না। অন্য সময়ে শশিভূষণ যে সকল গ্রন্থ পড়িতেন, তাহার মধ্য হইতে কোন না কোন অংশ গিরিবালাকে বুঝাইবার চেষ্টা করিতেন, কিন্তু ঐ স্থূলকায় কালো মলাটের পুস্তক হইতে গিরিবালাকে শুনাইবার যোগ্য কি দুটো কথাও ছিল না? তা না থাক্, তাই বলিয়া ঐ বই খানা কি এতই বড়, আর গিরিবালা কি এতই ছোট?

প্রথমটা, গুরুর মনোযোগ আকর্ষণের জন্য গিরিবালা সুর করিয়া বানান করিয়া বেণীসমেত দেহের উত্তরার্দ্ধ সবেগে দুলাইতে দুলাইতে উচ্চৈঃস্বরে আপনিই পড়া আরম্ভ করিয়া দিল। দেখিল তাহাতে বিশেষ ফল হইল না। কালো মোটা বইখানার উপর মনে মনে অত্যন্ত চটিয়া গেল। ওটাকে একটা কুৎসিত কঠোর নিষ্ঠুর মানুষের মত করিয়া দেখিতে

লাগিল। ওই বইখানা যে গিরিবালাকে বালিকা বলিয়া সম্পূর্ণ অবজ্ঞা করে তাহা যেন তাহার প্রত্যেক দুর্ব্বোধ পাতা দুষ্ট মানুষের মুখের মত আকার ধারণ করিয়া নীরবে প্রকাশ করিতে লাগিল। সেই বইখানা যদি কোন চোরে চুরি করিয়া লইয়া যাইত, তবে সেই চোরকে সে তাহার মাতৃ-ভাণ্ডারের সমস্ত কেয়াখয়ের চুরি করিয়া পুরস্কার দিতে পারিত। সেই বইখানার বিনাশের জন্য সে মনে মনে দেব-তার নিকট যে সকল অসঙ্গত ও অসম্ভব প্রার্থনা করিয়াছিল তাহা দেবতারা শুনেন নাই এবং পাঠকদিগকেও শুনাইবার কোন আবশ্যক দেখি না।

তখন ব্যথিতহৃদয় বালিকা দুই একদিন চারুপাঠহস্তে গুরু গৃহে গমন বন্ধ করিল। এবং সেই দুই একদিন পরে এই বিচ্ছেদের ফল পরীক্ষা করিয়া দেখিবার জন্য সে অন্য ছলে শশিভূষণের গৃহসম্মুখবর্ত্তী পথে আসিয়া কটাক্ষপাত করিয়া দেখিল শশিভূষণ সেই কালো বইখানা ফেলিয়া একাকী দাঁড়াইয়া হাত নাড়িয়া লোহার গরাদেগুলার প্রতি বিজাতীয় ভাষায় বক্তৃতা প্রয়োগ করিতেছেন। বোধ করি, বিচারকের মন কেমন করিয়া গলাইবেন এই লোহাগুলার উপর তাহার পরীক্ষা হইতেছে। সংসারে অনভিজ্ঞ, গ্রন্থ-বিহারী শশিভূষণের ধারণা ছিল যে, পুরাকালে ডিমস্থিনীস্, সিসিরো, বার্ক, শেরিডন্ প্রভৃতি বাগ্মীগণ বাক্যবলে যে সকল অসামান্য কার্য্য করিয়া গিয়াছেন; যেরূপ শব্দভেদী শরবর্ষণে

অন্যায়কে ছিন্নভিন্ন, অত্যাচারকে লাঞ্ছিত এবং অহঙ্কারকে ধূলিশায়ী করিয়া দিয়াছেন আজিকার দোকানদারীর দিনেও তাহা অসম্ভব নহে। প্রভুত্বমদগর্ব্বিত উদ্ধত ইংরাজকে কেমন করিয়া তিনি জগৎ সমক্ষে লজ্জিত ও অনুতপ্ত করিবেন তিল-কুচি গ্রামের জীর্ণ ক্ষুদ্র গৃহে দাঁড়াইয়া শশিভূষণ তাহারই চর্চ্চা করিতেছিলেন। আকাশের দেবতারা শুনিয়া হাসিয়াছিলেন কি তাঁহাদের দেবচক্ষু অশ্রুসিক্ত হইতেছিল তাহা কেহ বলিতে পারে না।

সুতরাং সে দিন গিরিবালা তাঁহার দৃষ্টিপথে পড়িল না। সে দিন বালিকার অঞ্চলে জাম ছিল না; পূর্ব্বে একবার জামের আঁটি ধরা পড়িয়া অবধি ঐ ফল সম্বন্ধে সে অত্যন্ত সঙ্কুচিত ছিল। এমন কি, শশিভূষণ যদি কোন দিন নিরীহ-ভাবে জিজ্ঞাসা করিত, "গিরি, আজ জাম নেই," সে সেটাকে গূঢ় উপহাস জ্ঞান করিয়া সক্ষোভে "যাঃ ও" বলিয়া তর্জ্জন করিয়া পলায়নের উপক্রম করিত। জামের আঁটির অভাবে আজ তাহাকে একটা কৌশল অবলম্বন করিতে হইল। সহসা দূরের দিকে দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া বালিকা উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিল—"স্বর্ণ, ভাই, তুই যাস্‌নে, আমি এখনি যাচ্ছি।"

পুরুষ পাঠক মনে করিতে পারেন, যে, কথাটা স্বর্ণলতা নামক কোন দূরবর্ত্তিনী সঙ্গিনীকে লক্ষ্য করিয়া উচ্চারিত, কিন্তু পাঠিকারা সহজেই বুঝিতে পারিবেন, দূরে কেহই ছিল না, লক্ষ্য অত্যন্ত নিকট! কিন্তু হায়, অন্ধ পুরুষের প্রতি

সে লক্ষ্য ভ্রষ্ট হইয়া গেল। শশিভূষণ যে, শুনিতে পান নাই, তাহা নহে, তিনি তাহার মর্ম্মগ্রহণ করিতে পারিলেন না। তিনি মনে করিলেন, বালিকা সত্যই ক্রীড়ার জন্য উৎসুক—এবং সে দিন তাহাকে খেলা হইতে অধ্যয়নে আকর্ষণ করিয়া আনিতে তাঁহার অধ্যবসায় ছিল না—কারণ তিনিও সে দিন কোন কোন হৃদয়ের দিকে লক্ষ্য করিয়া তীক্ষ্ণ শর সন্ধান করিতেছিলেন। বালিকার ক্ষুদ্র হস্তের সামান্য লক্ষ্য যেমন ব্যর্থ হইয়াছিল তাঁহার শিক্ষিত হস্তের মহৎ লক্ষ্যও সেইরূপ ব্যর্থ হইয়াছিল পাঠকেরা সে সংবাদ পূর্ব্বেই অবগত হইয়াছেন।

জামের আঁটির একটা গুণ এই যে, একে একে অনেকগুলি নিক্ষেপ করা যায়, চারিটি নিষ্ফল হইলে অন্ততঃ পঞ্চমটি ঠিক স্থানে গিয়া লাগিতে পারে। কিন্তু, স্বর্ণ হাজার কাল্পনিক হৌক, তাহাকে "এখনি যাচ্চি" আশা দিয়া অধিকক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকা যায় না। থাকিলে স্বর্ণের অস্তিত্ব সম্বন্ধে লোকের স্বভাবতই সন্দেহ জন্মিতে পারে। সুতরাং সে উপায়টি যখন নিষ্ফল হইল তখন গিরিবালাকে অবিলম্বে চলিয়া যাইতে হইল। তথাপি, স্বর্ণনাম্নী কোন দূরস্থিত সহচরীর সঙ্গ লাভ করিবার অভিলাষ আন্তরিক হইলে যেরূপ সবেগে উৎসাহের সহিত পাদচারণা করা স্বাভাবিক হইত, গিরিবালার গতিতে তাহা লক্ষিত হইল না। সে যেন তাহার পৃষ্ঠ দিয়া অনুভব করিবার চেষ্টা করিতেছিল পশ্চাতে কেহ

আসিতেছে কি না; যখন নিশ্চয় বুঝিল কেহ আসিতেছে না, তখন আশার শেষতম ক্ষীণতম ভগ্নাংশটুকু লইয়া একবার পশ্চাৎ ফিরিয়া চাহিয়া দেখিল, এবং কাহাকেও না দেখিয়া সেই ক্ষুদ্র আশাটুকু এবং শিথিলপত্র চারুপাঠখানি খণ্ড খণ্ড করিয়া ছিঁড়িয়া পথে ছড়াইয়া দিল। শশিভূষণ তাহাকে যে বিদ্যাটুকু দিয়াছে সেটুকু যদি সে কোন মতে ফিরাইয়া দিতে পারিত; তবে বোধ হয় পরিত্যজ্য জামের আঁটির মত সে সমস্তই শশিভূষণের দ্বারের সম্মুখে সশব্দে নিক্ষেপ করিয়া দিয়া চলিয়া আসিত। বালিকা প্রতিজ্ঞা করিল দ্বিতীয় বার শশিভূষণের সহিত দেখা হইবার পূর্ব্বেই সে সমস্ত পড়াশুনা ভুলিয়া যাইবে—তিনি যে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবেন তাহার কোনটিরই উত্তর দিতে পারিবে না! একটি, একটি, এক-টিরও না! তখন শশিভূষণ অত্যন্ত জব্দ হইবে!

গিরিবালার দুই চক্ষু জলে ভরিয়া আসিল। পড়া ভুলিয়া গেলে শশিভূষণের যে কিরূপ তীব্র অনুতাপের কারণ হইবে তাহা মনে করিয়া সে পীড়িত হৃদয়ে কিঞ্চিৎ সান্ত্বনা লাভ করিল, এবং কেবল মাত্র শশিভূষণের দোষে বিস্মৃতশিক্ষা সেই হতভাগিনী ভবিষ্যৎ গিরিবালাকে কল্পনা করিয়া তাহার নিজের প্রতি করুণারস উচ্ছ্বলিত হইয়া উঠিল। আকাশে মেঘ করিতে লাগিল; বর্ষাকালে এমন মেঘ প্রতিদিন করিয়া থাকে। গিরিবালা পথের প্রান্তে একটা গাছের আড়ালে দাঁড়াইয়া অভিমানে ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল; এমন

অকারণ কান্না প্রতিদিন কত বালিকা কাঁদিয়া থাকে! উহার মধ্যে লক্ষ্য করিবার বিষয় কিছুই ছিল না!

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

শশিভূষণের আইন সম্বন্ধীয় গবেষণা এবং বক্তৃতা-চর্চ্চা কি কারণে ব্যর্থ হইয়া গেল তাহা পাঠকদের অগোচর নাই। ম্যাজিষ্ট্রেটের নামে মকদ্দমা অকস্মাৎ মিটিয়া গেল। হরকুমার তাঁহাদের জেলার বেঞ্চে অনরারি ম্যাজিষ্ট্রেট্ নিযুক্ত হইলেন। একখানা মলিন চাপকান ও তৈলাক্ত পাগড়ি পরিয়া হরকুমার আজকাল প্রায়ই জেলায় গিয়া সাহেব সুবাদিগকে নিয়মিত সেলাম করিয়া আসেন।

শশিভূষণের সেই কালো মোটা বইখানার প্রতি এতদিন পরে গিরিবালার অভিশাপ ফলিতে আরম্ভ করিল; সে একটি অন্ধকার কোণে নির্ব্বাসিত হইয়া অনাদৃত বিস্মৃতভাবে ধূলিস্তর সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইল। কিন্তু তাহার অনাদর দেখিয়া যে বালিকা আনন্দ লাভ করিবে সেই গিরিবালা কোথায়!

শশিভূষণ যে দিন প্রথম আইনের গ্রন্থ বন্ধ করিয়া বসিলেন সেই দিনই হঠাৎ বুঝিতে পারিলেন গিরিবালা আসে নাই। তখন একে একে কয় দিনের ইতিহাস অল্পে অল্পে তাঁহার মনে পড়িতে লাগিল। মনে পড়িতে লাগিল একদিন উজ্জ্বল প্রভাতে গিরিবালা অঞ্চল ভরিয়া নববর্ষার আর্দ্র

বকুলফুল আনিয়াছিল। তাহাকে দেখিয়াও যখন তিনি গ্রন্থ হইতে দৃষ্টি তুলিলেন না, তখন তাহার উচ্ছ্বাসে সহসা বাধা পড়িল। সে তাহার অঞ্চলবিদ্ধ একটা স্থঁচ স্থতা বাহির করিয়া নতশিরে একটি একটি করিয়া ফুল লইয়া মালা গাঁথিতে লাগিল—মালা অত্যন্ত ধীরে ধীরে গাঁথিল, অনেক বিলম্বে শেষ হইল—বেলা হইয়া আসিল, গিরিবালার ঘরে ফিরিবার সময় হইল, তথাপি শশিভূষণের পড়া শেষ হইল না। গিরিবালা মালাটা তক্তপোষের উপর রাখিয়া ম্লানভাবে চলিয়া গেল। মনে পড়িল, তাহার অভিমান প্রতিদিন কেমন করিয়া ঘনীভূত হইয়া উঠিল; কবে হইতে সে তাঁহার ঘরে প্রবেশ না করিয়া ঘরের সম্মুখবর্ত্তী পথে মধ্যে মধ্যে দেখা দিত এবং চলিয়া যাইত; অবশেষে কবে হইতে বালিকা সেই পথে আসাও বন্ধ করিয়াছে। সেও ত আজ কিছুদিন হইল। গিরিবালার অভিমান ত এতদিন স্থায়ী হয় না। শশিভূষণ একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া হতবুদ্ধি হতকর্ম্মের মত দেয়ালে পিঠ দিয়া বসিয়া রহিলেন। ক্ষুদ্র ছাত্রীটি না আসাতে তাঁহার পাঠ্যগ্রন্থগুলি নিতান্ত বিস্বাদ হইয়া আসিল। বই টানিয়া টানিয়া লইয়া দুই চারি পাতা পড়িয়া ফেলিয়া দিতে হয়। লিখিতে লিখিতে ক্ষণে ক্ষণে সচকিতে পথের দিকে দ্বারের অভিমুখে প্রতীক্ষাপূর্ণ দৃষ্টি বিক্ষিপ্ত হইতে থাকে এবং লেখা ভঙ্গ হয়।

শশিভূষণের আশঙ্কা হইল গিরিবালার অসুখ হইয়া থাকিবে। গোপনে সন্ধান লইয়া জানিলেন সে আশঙ্কা অমূ-

লক। গিরিবালা আজকাল আর ঘর হইতে বাহির হয় না। তাহার জন্য পাত্র স্থির হইয়াছে।

গিরি যে দিন চারুপাঠের ছিন্নখণ্ডে গ্রামের পঙ্কিল পথ বিকীর্ণ করিয়াছিল তাহার পরদিন প্রত্যুষে ক্ষুদ্র অঞ্চলে বিচিত্র উপহার সংগ্রহ করিয়া দ্রুতপদে ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিতেছিল। অতিশয় গ্রীষ্ম হওয়াতে নিদ্রাহীন রাত্রি অতিবাহন করিয়া হরকুমার ভোরবেলা হইতে বাহিরে বসিয়া গা খুলিয়া তামাক খাইতেছিলেন। গিরিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কোথায় যাচ্চিস্? গিরি কহিল "শশি দাদার বাড়ি!" হরকুমার ধমক দিয়া কহিলেন, "শশি দাদার বাড়ি যেতে হবে না, ঘরে যা!" এই বলিয়া আসন্ন-শ্বশুর-গৃহবাস বয়ঃপ্রাপ্ত কন্যার লজ্জার অভাব সম্বন্ধে বিস্তর তিরস্কার করিলেন। সেই দিন হইতে তাহার বাহিরে আসা বন্ধ হইয়াছে। এবার আর তাহার অভিমান ভঙ্গ করিবার অবসর জুটিল না। আমসত্ত্ব, কেয়াখয়ের এবং জারকনেবু ভাণ্ডারের যথাস্থানে ফিরিয়া গেল। বৃষ্টি পড়িতে লাগিল, বকুল ফুল ঝরিতে লাগিল, গাছ ভরিয়া পেয়ারা পাকিয়া উঠিল এবং শাখাস্খলিত পক্ষীচঞ্চুক্ষত সুপক্ক কালোজামে তরুতল প্রতিদিন সমাচ্ছন্ন হইতে লাগিল। হায়, সেই ছিন্নপ্রায় চারুপাঠখানিও আর নাই!

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

গ্রামে গিরিবালার বিবাহে যে দিন শানাই বাজিতেছিল সে দিন অনিমন্ত্রিত শশিভূষণ নৌকা করিয়া কলিকাতা অভিমুখে চলিতেছিলেন।

মকদ্দমা উঠাইয়া লওয়া অবধি হরকুমার শশিকে বিষচক্ষে দেখিতেন। কারণ, তিনি মনে মনে স্থির করিয়াছিলেন, শশি তাঁহাকে নিশ্চয় ঘৃণা করিতেছে। শশির মুখে চখে ব্যবহারে তিনি তাহার সহস্র কাল্পনিক নিদর্শন দেখিতে লাগিলেন। গ্রামের সকল লোকেই তাঁহার অপমান বৃত্তান্ত ক্রমশঃ বিস্মৃত হইতেছে, কেবল শশিভূষণ একাকী সেই দুঃস্মৃতি জাগাইয়া রাখিয়াছেন মনে করিয়া তিনি তাঁহাকে দুই চক্ষে দেখিতে পারিতেন না। তাহার সহিত সাক্ষাৎ হইবামাত্র তাঁহার অন্তঃকরণের মধ্যে একটুখানি সলজ্জ সঙ্কোচ এবং সেই সঙ্গে প্রবল আক্রোশের সঞ্চার হইত। শশিকে গ্রামছাড়া করিতে হইবে বলিয়া হরকুমার প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিলেন।

শশিভূষণের মত লোককে গ্রামছাড়া করা কাজটা তেমন দুরূহ নহে। নায়েব মহাশয়ের অভিপ্রায় অনতিবিলম্বে সফল হইল। একদিন সকাল বেলা পুস্তকের বোঝা এবং গুটিদুইচার টিনের বাক্স সঙ্গে লইয়া শশি নৌকায় চড়িলেন। গ্রামের সহিত তাঁহার যে একটি সুখের বন্ধন ছিল সেও আজ সমারোহ সহকারে ছিন্ন হইতেছে। সুকোমল বন্ধনটি যে কত দৃঢ়-

ভাবে তাঁহার হৃদয়কে বেষ্টন করিয়া ধরিয়াছিল তাহা তিনি পূর্ব্বে সম্পূর্ণরূপে জানিতে পারেন নাই। আজ যখন নৌকা ছাড়িয়া দিল, গ্রামের বৃক্ষচূড়াগুলি অস্পষ্ট এবং উৎসবের বাদ্যধ্বনি ক্ষীণতর হইয়া আসিল, তখন সহসা অশ্রুবাষ্পে হৃদয় স্ফীত হইয়া উঠিয়া তাঁহার কণ্ঠরোধ করিয়া ধরিল, রক্তোচ্ছ্বাসবেগে কপালের শিরাগুলা টন্ টন্ করিতে লাগিল, এবং জগৎসংসারের সমস্ত দৃশ্য ছায়া-নির্ম্মিত মায়ামরীচিকার মত অত্যন্ত অস্পষ্ট প্রতিভাত হইল।

প্রতিকূল বাতাস অতিশয় বেগে বহিতেছিল, সেই জন্য স্রোত অনুকূল হইলেও নৌকা ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছিল। এমন সময়ে নদীর মধ্যে এক কাণ্ড ঘটিল যাহাতে শশিভূষণের যাত্রার ব্যাঘাত করিয়া দিল।

ষ্টেশন ঘাট হইতে সদর মহকুমা পর্য্যন্ত একটি নূতন ষ্টীমার লাইন সম্প্রতি খুলিয়াছে। সেই ষ্টীমারটি সশব্দে পক্ষ সঞ্চালন করিয়া ঢেউ তুলিয়া উজানে আসিতেছিল। জাহাজে নূতন লাইনের অল্পবয়স্ক ম্যানেজার সাহেব এবং অল্প সংখ্যক যাত্রী ছিল। যাত্রীদের মধ্যে শশিভূষণের গ্রাম হইতেও কেহ কেহ উঠিয়াছিল।

একটি মহাজনের নৌকা কিছু দূর হইতে এই ষ্টীমারের সহিত পাল্লা দিয়া আসিতে চেষ্টা করিতেছিল, আবার মাঝে মাঝে ধরিধরি করিতেছিল, আবার মাঝে মাঝে পশ্চাতে পড়িতেছিল। মাঝির ক্রমশঃ রোখ চাপিয়া গেল। সে প্রথম

পালের উপর দ্বিতীয় পাল এবং দ্বিতীয় পালের উপরে ক্ষুদ্র তৃতীয় পালটা পর্য্যন্ত তুলিয়া দিল। বাতাসের বেগে সুদীর্ঘ মাস্তুল সম্মুখে আনত হইয়া পড়িল, এবং বিদীর্ণ তরঙ্গরাশি অট্টকলস্বরে নৌকার দুই পার্শ্বে উন্মত্তভাবে নৃত্য করিতে লাগিল। নৌকা তখন ছিন্নবল্গা অশ্বের ন্যায় ছুটিয়া চলিল। এক স্থানে ষ্টীমারের পথ কিঞ্চিৎ বাঁকা ছিল, সেইখানে সংক্ষিপ্ততর পথ অবলম্বন করিয়া নৌকা ষ্টীমারকে ছাড়াইয়া গেল। ম্যানেজার সাহেব আগ্রহভরে রেলের উপর ঝুঁকিয়া নৌকার এই প্রতিযোগিতা দেখিতেছিল। যখন নৌকা তাহার পূর্ণতম বেগ প্রাপ্ত হইয়াছে, এবং ষ্টীমারকে হাত দুয়েক ছাড়াইয়া গিয়াছে এমন সময়ে সাহেব হঠাৎ একটা বন্দুক তুলিয়া স্ফীত পাল লক্ষ্য করিয়া আওয়াজ করিয়া দিল। এক মুহূর্ত্তে পাল ফাটিয়া গেল, নৌকা ডুবিয়া গেল, ষ্টীমার নদীর বাঁকের অন্তরালে অদৃশ্য হইয়া গেল।

ম্যানেজার কেন যে এমন করিল তাহা বলা কঠিন। ইংরাজ নন্দনের মনের ভাব আমরা বাঙ্গালী হইয়া ঠিক বুঝিতে পারি না। হয়ত দিশী পালের প্রতিযোগিতা সে সহ্য করিতে পারে নাই, হয়ত একটা স্ফীত বিস্তীর্ণ পদার্থ বন্দুকের গুলির দ্বারা চক্ষের পলকে বিদীর্ণ করিবার একটা হিংস্র প্রলোভন আছে, হয়ত, এই গর্ব্বিত নৌকাটার বস্ত্রখণ্ডের মধ্যে গুটিকয়েক ফুটা করিয়া নিমেষের মধ্যে ইহার নৌকা-লীলা সমাপ্ত করিয়া দিবার মধ্যে একটা প্রবল পৈশাচিক

হাস্যরস আছে ; নিশ্চয় জানি না। কিন্তু ইহা নিশ্চয়, ইংরা-জের মনের ভিতরে একটুখানি বিশ্বাস ছিল যে, এই রসি-কতাটুকু করার দরুণ সে কোনরূপ শাস্তির দায়িক নহে—এবং ধারণা ছিল, যাহাদের নৌকা গেল এবং সম্ভবতঃ প্রাণ সংশয়, তাহারা মানুষের মধ্যেই গণ্য হইতে পারে না।

সাহেব যখন বন্দুক তুলিয়া গুলি করিল এবং নৌকা ডুবিয়া গেল তখন শশিভূষণের পান্সী ঘটনাস্থলের নিকটবর্ত্তী হইয়াছে। শেষোক্ত ব্যাপারটি শশিভূষণ প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইলেন। তাড়াতাড়ি নৌকা লইয়া গিয়া মাঝি এবং মাল্লা-দিগকে উদ্ধার করিলেন। কেবল এক ব্যক্তি ভিতরে বসিয়া রন্ধনের জন্য মসলা পিশিতেছিল, তাহাকে আর দেখা গেল না। বর্ষার নদী খরবেগে বহিয়া চলিল।

শশিভূষণের হৃৎপিণ্ডের মধ্যে উত্তপ্ত রক্ত ফুটিতে লাগিল। আইন অত্যন্ত মন্দগতি—সে একটা বৃহৎ জটিল লৌহযন্ত্রের মত ; তৌল করিয়া সে প্রমাণ গ্রহণ করে এবং নির্ব্বিকার ভাবে সে শাস্তি বিভাগ করিয়া দেয়, তাহার মধ্যে মানব-হৃদয়ের উত্তাপ নাই। কিন্তু ক্ষুধার সহিত ভোজন, ইচ্ছার সহিত উপভোগ ও রোষের সহিত শাস্তিকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেওয়া শশিভূষণের নিকট সমান অস্বাভাবিক বলিয়া বোধ হইল। অনেক অপরাধ আছে যাহা প্রত্যক্ষ করিবামাত্র তৎক্ষণাৎ নিজহস্তে তাহার শাস্তিবিধান না করিলে অন্তর্যামী বিধাতা পুরুষ যেন অন্তরের মধ্যে থাকিয়া প্রত্যক্ষকারীকে

দগ্ধ করিতে থাকেন। তখন, আইনের কথা স্মরণ করিয়া সান্ত্বনা লাভ করিতে হৃদয় লজ্জা বোধ করে। কিন্তু কলের আইন এবং কলের জাহাজ ম্যানেজারটিকে শশিভূষণের নিকট হইতে দূরে লইয়া গেল। তাহাতে জগতের আর আর কি উপকার হইয়াছিল বালিতে পারি না কিন্তু সে যাত্রায় নিঃসন্দেহ শশিভূষণের ভারতবর্ষীয় প্লীহা রক্ষা পাইয়াছিল।

মাঝিমাল্লা যাহারা বাঁচিল তাহাদিগকে লইয়া শশি গ্রামে ফিরিয়া আসিলেন। নৌকায় পাট বোঝাই ছিল, সেই পাট উদ্ধারের জন্য লোক নিযুক্ত করিয়া দিলেন এবং মাঝিকে ম্যানেজারের বিরুদ্ধে পুলিসে দরখাস্ত দিতে অনুরোধ করিলেন।

মাঝি কিছুতেই সম্মত হয় না। সে বলিল নৌকা ত মজিয়াছে এক্ষণে নিজেকে মজাইতে পারিব না। প্রথমতঃ পুলিসকে দর্শনি দিতে হইবে, তাহার পর কাজকর্ম্ম আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া আদালতে আদালতে ঘুরিতে হইবে, তাহার পর সাহেবের নামে নালিশ করিয়া কি বিপাকে পড়িতে হইবে ও কি ফল লাভ হইবে তাহা ভগবান জানেন। অবশেষে সে যখন জানিল, শশিভূষণ নিজে উকীল, আদালত-খরচা তিনিই বহন করিবেন এবং মকদ্দমায় ভবিষ্যতে খেসারৎ পাইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা আছে তখন রাজি হইল। কিন্তু শশিভূষণের গ্রামের লোক যাহারা ষ্টীমারে উপস্থিত ছিল তাহারা কিছুতেই সাক্ষ্য দিতে চাহিল না। তাহারা শশিভূষণকে কহিল, মহাশয়, আমরা কিছুই দেখি নাই;

আমরা জাহাজের পশ্চাৎ ভাগে ছিলাম, কলের ঘট্‌ঘট্‌ এবং জলের কল্‌ কল্‌ শব্দে সেখান হইতে বন্দুকের আওয়াজ শুনিবারও কোন সম্ভাবনা ছিল না।

দেশের লোককে আন্তরিক ধিক্কার দিয়া শশিভূষণ ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট মকদ্দমা চালাইলেন।

সাক্ষীর কোন আবশ্যক হইল না। ম্যানেজার স্বীকার করিল যে, সে বন্দুক ছুঁড়িয়াছিল। কহিল, আকাশে এক ঝাঁক বক উড়িতেছিল তাহাদেরই প্রতি লক্ষ্য করা হইয়াছিল। ষ্টীমার তখন পূর্ণবেগে চলিতেছিল এবং সেই মুহূর্ত্তেই নদীর বাঁকের অন্তরালে প্রবেশ করিয়াছিল। সুতরাং সে জানিতেও পারে নাই, কাক মরিল, কি বক মরিল, কি নৌকাটা ডুবিল। অন্তরীক্ষে এবং পৃথিবীতে এত শিকারের জিনিষ আছে, যে, কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি ইচ্ছাপূর্ব্বক "ডার্টি র‍্যাগ্‌" অর্থাৎ মলিন বস্ত্রখণ্ডের উপর শিকিপয়সা দামেরও ছিটাগুলি অপব্যয় করিতে পারে না।

বেকসুর খালাস পাইয়া ম্যানেজার সাহেব চুরট ফুঁকিতে ফুঁকিতে ক্লাবে হুইষ্ট্‌ খেলিতে গেল; যে লোকটা নৌকার মধ্যে মশলা পিশিতেছিল, নয় মাইল তফাতে তাহার মৃতদেহ ডাঙ্গায় আসিয়া লাগিল এবং শশিভূষণ চিত্তদাহ লইয়া আপন গ্রামে ফিরিয়া আসিলেন।

যে দিন ফিরিয়া আসিলেন, সে দিন নৌকা সাজাইয়া গিরিবালাকে শ্বশুরবাড়ি লইয়া যাইতেছে। যদিও তাঁহাকে

কেহ ডাকে নাই, তথাপি শশিভূষণ ধীরে ধীরে নদীতীরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ঘাটে লোকের ভিড় ছিল সেখানে না গিয়া কিছু দূরে অগ্রসর হইয়া দাঁড়াইলেন। নৌকা ঘাট ছাড়িয়া যখন তাঁহার সম্মুখ দিয়া চলিয়া গেল তখন চকিতের মত একবার দেখিতে পাইলেন, মাথায় ঘোমটা টানিয়া নববধূ নতশিরে বসিয়া আছে। অনেক দিন হইতে গিরিবালার আশা ছিল, যে, গ্রাম ত্যাগ করিয়া যাইবার পূর্ব্বে কোন মতে একবার শশিভূষণের সহিত সাক্ষাৎ হইবে কিন্তু আজ সে জানিতেও পারিল না, যে, তাহার গুরু অনতিদূরে তীরে দাঁড়াইয়া আছেন। একবার সে মুখ তুলিয়াও দেখিল না, কেবল নিঃশব্দ রোদনে তাহার দুই কপোল বাহিয়া অশ্রুজল ঝরিয়া পড়িতে লাগিল।

নৌকা ক্রমশঃ দূরে চলিয়া অদৃশ্য হইয়া গেল। জলের উপর প্রভাতের রৌদ্র ঝিক্ ঝিক্ করিতে লাগিল, নিকটের আম্রশাখায় একটা পাপিয়া উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে মুহুর্মুহু গান গাহিয়া মনের আবেগ কিছুতেই নিঃশেষ করিতে পারিল না, খেয়ানৌকা লোক বোঝাই লইয়া পারাপার হইতে লাগিল, মেয়েরা ঘাটে জল লইতে আসিয়া উচ্চ কলস্বরে গিরির শ্বশুরালয় যাত্রার আলোচনা তুলিল, শশিভূষণ চষমা খুলিয়া চোখ মুছিয়া সেই পথের ধারে সেই গরাদের মধ্যে সেই ক্ষুদ্র গৃহে গিয়া প্রবেশ করিলেন। হঠাৎ একবার মনে হইল যেন গিরিবালার কণ্ঠ শুনিতে পাইলেন! "শশিদাদা!"—কোথায়

রে কোথায়? কোথাও না! সে গৃহে না, সে পথে না, সে গ্রামে না—তাঁহার অশ্রুজলাভিষিক্ত অন্তরের মাঝখানটিতে।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

শশিভূষণ পুনরায় জিনিষপত্র বাঁধিয়া কলিকাতা অভিমুখে যাত্রা করিলেন। কলিকাতায় কোন কাজ নাই, সেখানে যাওয়ার কোন বিশেষ উদ্দেশ্য নাই; সেই জন্য রেলপথে না গিয়া বরাবর নদীপথে যাওয়াই স্থির করিলেন।

তখন পূর্ণবর্ষায় বাঙ্গলা দেশের চারিদিকেই ছোট বড় আঁকাবাঁকা সহস্র জলময় জাল বিস্তীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। সরস শ্যামল বঙ্গভূমির শিরা উপশিরাগুলি পরিপূর্ণ হইয়া তরুলতা তৃণগুল্ম ঝোপঝাড় ধান পাট ইক্ষুতে দশদিকে উন্মত্ত যৌবনের প্রাচুর্য্য যেন একেবারে উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠিয়াছে।

শশিভূষণের নৌকা সেই সমস্ত সঙ্কীর্ণ বক্র জলস্রোতের মধ্য দিয়া চলিতে লাগিল। জল তখন তীরের সহিত সমতল হইয়া গিয়াছে। কাশবন শরবন এবং স্থানে স্থানে শস্যক্ষেত্র জলমগ্ন হইয়াছে। গ্রামের বেড়া, বাঁশঝাড় ও আমবাগান একেবারে জলের অব্যবহিত ধারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে—দেবকন্যারা যেন বাঙ্গলা দেশের তরুমূলবর্ত্তী আলবালগুলি জলসেচনে পরিপূর্ণ করিয়া দিয়াছেন।

যাত্রার আরম্ভকালে স্নানচিক্কণ বনশ্রী রৌদ্রে উজ্জ্বল

হাস্যময় ছিল, অনতিবিলম্বেই মেঘ করিয়া বৃষ্টি আরম্ভ হইল। তখন যে দিকে বৃষ্টি পড়ে সেই দিকই বিষণ্ণ এবং অপরিচ্ছন্ন দেখাইতে লাগিল। বন্যার সময়ে গরুগুলি যেমন জলবেষ্টিত মলিন পঙ্কিল সঙ্কীর্ণ গোষ্ঠপ্রাঙ্গণের মধ্যে ভিড় করিয়া করুণ-নেত্রে সহিষ্ণুভাবে দাঁড়াইয়া শ্রাবণের ধারাবর্ষণে ভিজিতে থাকে, বাঙ্গলা দেশ আপনার কর্দ্দমপিচ্ছিল ঘনসিক্ত রুদ্ধ জঙ্গলের মধ্যে মূক বিষণ্ণমুখে সেইরূপ পীড়িত ভাবে অবিশ্রাম ভিজিতে লাগিল। চাষীরা টোকা মাথায় দিয়া বাহির হই-য়াছে, স্ত্রীলোকেরা ভিজিতে ভিজিতে বাদলার শীতল বায়ুতে সঙ্কুচিত হইয়া কুটীর হইতে কুটীরান্তরে গৃহকার্য্যে যাতায়াত করিতেছে ও পিছল ঘাটে অত্যন্ত সাবধানে পা ফেলিয়া সিক্ত-বস্ত্রে জল তুলিতেছে, এবং গৃহস্থ পুরুষেরা দাওয়ায় বসিয়া তামাক খাইতেছে, নিতান্ত কাজের দায় থাকিলে কোমরে চাদর জড়াইয়া জুতা হস্তে ছাতি মাথায় বাহির হইতেছে। অবলা রমণীর মস্তকে ছাতি এই রৌদ্রদগ্ধ বর্ষাপ্লাবিত বঙ্গ-দেশের সনাতন পবিত্র প্রথার মধ্যে নাই।

বৃষ্টি যখন কিছুতেই থামে না তখন রুদ্ধ নৌকার মধ্যে বিরক্ত হইয়া উঠিয়া শশিভূষণ পুনশ্চ রেলপথে যাওয়াই স্থির করিলেন। এক জায়গায় একটা প্রশস্ত মোহানার মত জায়-গায় আসিয়া শশিভূষণ নৌকা বাঁধিয়া আহারের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন।

খোঁড়ার পা খানায় পড়ে—সে কেবল খানার দোষ নয়,

খোঁড়ার পাটারও পড়িবার দিকে একটু বিশেষ ঝোঁক আছে। শশিভূষণ সে দিন তাহার একটা প্রমাণ দিলেন।

দুই নদীর মোহানার মুখে বাঁশ বাঁধিয়া জেলেরা একটা প্রকাণ্ড জাল পাতিয়াছে। কেবল একপার্শ্বে নৌকা চলাচলের স্থান রাখিয়াছে। বহুকাল হইতে তাহারা এ কার্য্য করিয়া থাকে এবং সে জন্য খাজনাও দেয়। দুর্ভাগ্যক্রমে এ বৎসর এই পথে হঠাৎ জেলার পুলিস্ সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট্ বাহাদুরের শুভাগমন হইয়াছে। তাঁহার বোট আসিতে দেখিয়া জেলেরা পূর্ব্ব হইতে পার্শ্ববর্ত্তী পথ নির্দ্দেশ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে সাবধান করিয়া দিল। কিন্তু মনুষ্যরচিত কোন বাধাকে সম্মান প্রদর্শন করিয়া ঘুরিয়া যাওয়া সাহেবের মাঝির অভ্যাস নাই। সে সেই জালের উপর দিয়াই বোট চালাইয়া দিল। জাল অবনত হইয়া বোটকে পথ ছাড়িয়া দিল, কিন্তু, তাহার হাল বাধিয়া গেল। কিঞ্চিৎ বিলম্বে এবং চেষ্টায় হাল ছাড়াইয়া লইতে হইল।

পুলিস সাহেব অত্যন্ত গরম এবং রক্তবর্ণ হইয়া বোট বাঁধিলেন। তাঁহার মূর্ত্তি দেখিয়াই জেলে চারটে উর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল। সাহেব তাঁহার মাল্লাদিগকে, জাল কাটিয়া ফেলিতে আদেশ করিলেন। তাহারা সেই সাত আট শত টাকার বৃহৎ জাল কাটিয়া টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া ফেলিল।

জালের উপর ঝাল ঝাড়িয়া অবশেষে জেলেদিগকে ধরিয়া আনিবার আদেশ হইল। কনৃষ্টেবল্ পলাতক জেলে

চারিটির সন্ধান না পাইয়া যে চারিজনকে হাতের কাছে পাইল তাহাদিগকে ধরিয়া আনিল। তাহারা আপনাদিগকে নিরপরাধী বলিয়া যোড়হস্তে কাকুতিমিনতি করিতে লাগিল। পুলিস্ বাহাদুর যখন সেই বন্দীদিগকে সঙ্গে লইবার হুকুম দিতেছেন, এমন সময় চস্‌মা-পরা শশিভূষণ তাড়াতাড়ি একখানা জামা পরিয়া তাহার বোতাম না লাগাইয়া চটিজুতা চট্‌চট্ করিতে করিতে ঊর্দ্ধশ্বাসে পুলিসের বোটের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কম্পিতস্বরে কহিলেন, "সার্, জেলের জাল ছিঁড়িবার এবং এই চারিজন লোককে উৎপীড়ন করিবার তোমার কোন অধিকার নাই।"

পুলিসের বড়কর্ত্তা তাঁহাকে হিন্দিভাষায় একটা বিশেষ অসম্মানের কথা বলিবামাত্র তিনি এক মুহূর্ত্তে কিঞ্চিৎ উচ্চ ডাঙ্গা হইতে বোটের মধ্যে লাফাইয়া পড়িয়াই একেবারে সাহেবের উপরে আপনাকে নিক্ষেপ করিলেন। বালকের মত পাগলের মত মারিতে লাগিলেন।

তাহার পর কি হইল তিনি জানেন না। পুলিসের থানার মধ্যে যখন জাগিয়া উঠিলেন, তখন—বলিতে সঙ্কোচ বোধ হয়—যেরূপ ব্যবহার প্রাপ্ত হইলেন তাহাতে মানসিক সম্মান অথবা শারীরিক আরাম বোধ করিলেন না।

নবম পরিচ্ছেদ।

শশিভূষণের বাপ উকীল ব্যারিষ্টার লাগাইয়া প্রথমতঃ শশিকে হাজত হইতে জামিনে খালাস করিলেন। তাহার পরে মকদ্দমার যোগাড় চলিতে লাগিল।

যে সকল জেলের জাল নষ্ট হইয়াছে তাহারা শশিভূষণের এক পরগণার অন্তর্গত, এক জমিদারের অধীন। বিপদের সময় কখন কখন শশির নিকটে তাহারা আইনের পরামর্শ লইতেও আসিত। যাহাদিগকে সাহেব বোটে ধরিয়া আনিয়াছিলেন তাহারাও শশিভূষণের অপরিচিত নহে।

শশি তাহাদিগকে সাক্ষ্য মানিবেন বলিয়া ডাকাইয়া আনিলেন। তাহারা ভয়ে অস্থির হইয়া উঠিল। স্ত্রীপুত্র পরিবার লইয়া যাহাদিগকে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হয় পুলিসের সহিত বিবাদ করিলে তাহারা কোথায় গিয়া নিষ্কৃতি পাইবে? একটার অধিক প্রাণ কাহার শরীরে আছে? যাহা লোকসান হইবার তাহাত হইয়াছে, এখন আবার সাক্ষ্যের সপিনা ধরাইয়া এ কি মুস্কিল! সকলে বলিল, "ঠাকুর তুমি ত আমাদিগকে বিষম ফেসাদে ফেলিলে!"

বিস্তর বলা কহার পর তাহারা সত্য কথা বলিতে স্বীকার করিল।

ইতিমধ্যে হরকুমার যে দিন বেঞ্চের কর্ম্মোপলক্ষে জেলার

সাহেবদিগকে সেলাম করিতে গেলেন পুলিস সাহেব হাসিয়া কহিলেন, নায়েব বাবু শুনিতেছি তোমার প্রজারা পুলিসের বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে প্রস্তুত হইয়াছে। নায়েব সচকিত হইয়া কহিলেন, হাঁ! এও কি কথনো সম্ভব হয়? অপবিত্র জন্তুজাত পুত্রদিগের অস্থিতে এত ক্ষমতা!

সংবাদপত্র পাঠকেরা অবগত আছেন মকদ্দমায় শশিভূষণের পক্ষ কিছুতেই টিঁকিতে পারিল না।

জেলেরা একে একে আসিয়া কহিল, পুলিস সাহেব তাহাদের জাল কাটিয়া দেন নাই; বোটে ডাকিয়া তাহাদের নাম ধাম লিখিয়া লইতেছিলেন।

কেবল তাহাই নহে, তাঁহার দেশস্থ গুটিচারেক পরিচিত লোক সাক্ষ্য দিল যে, তাহারা সে সময়ে ঘটনাস্থলে বিবাহের বরযাত্র উপলক্ষ্যে উপস্থিত ছিল। শশিভূষণ যে, অকারণে অগ্রসর হইয়া পুলিসের পাহারাওয়ালাদের প্রতি উপদ্রব করিয়াছে তাহা তাহারা প্রত্যক্ষ দেখিয়াছে!

শশিভূষণ স্বীকার করিলেন, যে, গালি খাইয়া বোটের মধ্যে প্রবেশ করিয়া তিনি সাহেবকে মারিয়াছেন। কিন্তু জাল কাটিয়া দেওয়া ও জেলেদের প্রতি উপদ্রবই তাহার মূল কারণ।

এরূপ অবস্থায়, যে বিচারে শশিভূষণ শাস্তি পাইলেন তাহাকে অন্যায় বলা যাইতে পারে না। তবে শাস্তিটা কিছু গুরুতর হইল। তিন চারিটা অভিযোগ, আঘাত, অনধিকার-

প্রবেশ, পুলিসের কর্ত্তব্যে ব্যাঘাত ইত্যাদি; সব কটাই তাঁহার বিরুদ্ধে পূরা প্রমাণ হইল।

শশিভূষণ তাঁহার সেই ক্ষুদ্র গৃহে তাঁহার প্রিয় পাঠ্য গ্রন্থগুলি ফেলিয়া পাঁচ বৎসর জেল খাটিতে গেলেন! তাঁহার বাপ আপিল করিতে উদ্যত হইল, তাঁহাকে শশিভূষণ বারম্বার নিষেধ করিলেন—কহিলেন, জেল ভাল! লোহার বেড়ি মিথ্যা কথা বলে না, কিন্তু জেলের বাহিরে যে স্বাধীনতা আছে সে আমাদিগকে প্রতারণা করিয়া বিপদে ফেলে। আর যদি সৎসঙ্গের কথা বল, ত, জেলের মধ্যে মিথ্যাবাদী কৃতঘ্ন কাপুরুষের সংখ্যা অল্প, কারণ স্থান পরিমিত—বাহিরে অনেক বেশি!

দশম পরিচ্ছেদ।

শশিভূষণ জেলে প্রবেশ করিবার অনতিকাল পরেই তাঁহার পিতার মৃত্যু হইল। তাঁহার আর বড় কেহ ছিল না। এক ভাই বহুকাল হইতে সেণ্ট্রাল প্রভিন্সে কাজ করিতেন, দেশে আসা তাঁহার বড় ঘটিয়া উঠিত না, সেইখানেই তিনি বাড়ি তৈয়ারি করিয়া সপরিবারে স্থায়ী হইয়া বসিয়াছিলেন। দেশে বিষয় সম্পত্তি যাহা ছিল, নায়েব হরকুমার তাহার অধিকাংশ নানা কৌশলে আত্মসাৎ করিলেন।

জেলের মধ্যে অধিকাংশ কয়েদীকে যে পরিমাণে দুঃখ

ভোগ করিতে হয় দৈববিপাকে শশিভূষণকে তদপেক্ষা অনেক বেশি সহ্য করিতে হইয়াছিল। তথাপি দীর্ঘ পাঁচ বৎসর কাটিয়া গেল।

আবার একদা বর্ষার দিনে জীর্ণ শরীর ও শূন্য হৃদয় লইয়া শশিভূষণ কারা-প্রাচীরের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলেন। স্বাধীনতা পাইলেন, কিন্তু তাহা ছাড়া কারার বাহিরে তাঁহার আর কেহ অথবা আর কিছু ছিল না। গৃহহীন আত্মীয়হীন সমাজহীন কেবল তাঁহার একলাটির পক্ষে এতবড় জগৎ সংসার অত্যন্ত ঢিলা বলিয়া ঠেকিতে লাগিল।

জীবনযাত্রার বিচ্ছিন্ন সূত্র আবার কোথা হইতে আরম্ভ করিবেন এই কথা ভাবিতেছেন এমন সময়ে এক বৃহৎ জুড়ি তাঁহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। এক জন ভৃত্য নামিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, আপনার নাম শশিভূষণ বাবু?—

তিনি কহিলেন হাঁ।—

সে তৎক্ষণাৎ গাড়ির দরজা খুলিয়া তাঁহার প্রবেশের প্রতীক্ষায় দাঁড়াইল।—

তিনি আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—আমাকে কোথায় যাইতে হইবে?—

সে কহিল, আমার প্রভু আপনাকে ডাকিয়াছেন।

পথিকদের কৌতূহল দৃষ্টিপাত অসহ্য বোধ হওয়াতে তিনি সেখানে আর অধিক বাদানুবাদ না করিয়া গাড়িতে উঠিয়া পড়িলেন। ভাবিলেন নিশ্চয় ইহার মধ্যে একটা কিছু ভ্রম

আছে। কিন্তু একটা কোন দিকে ত চলিতে হইবে—না হয় এমনি করিয়া ভ্রম দিয়াই এই নূতন জীবনের ভূমিকা আরম্ভ হউক।

সে দিনও মেঘ এবং রৌদ্র আকাশময় পরস্পরকে শিকার করিয়া ফিরিতেছিল। পথের প্রান্তবর্ত্তী বর্ষার জলপ্লাবিত গাঢ়-শ্যাম শস্যক্ষেত্র চঞ্চল ছায়ালোকে বিচিত্র হইয়া উঠিতেছিল। হাটের কাছে একটা বৃহৎ রথ পড়িয়াছিল এবং তাহার অদূর-বর্ত্তী মুদির দোকানে একদল বৈষ্ণব ভিক্ষুক গুপিযন্ত্র ও খোল-করতাল যোগে গান গাহিতেছিল—

এস এস ফিরে এস—নাথ হে ফিরে এস!
আমার ক্ষুধিত তৃষিত তাপিত চিত, বঁধুহে ফিরে এস!

গাড়ি অগ্রসর হইয়া চলিল, গানের পদ ক্রমে দূর হইতে দূরতর হইয়া কানে প্রবেশ করিতে লাগিল—

ওগো নিষ্ঠুর ফিরে এস হে আমার করুণ কোমল এস!
ও গো সজল জলদ স্নিগ্ধকান্ত সুন্দর ফিরে এস!

গানের কথা ক্রমে ক্ষীণতর অস্ফুটতর হইয়া আসিল, আর বুঝা গেল না। কিন্তু গানের ছন্দে শশিভূষণের হৃদয়ে একটা আন্দোলন তুলিয়া দিল, তিনি আপন মনে গুন্‌গুন্ করিয়া পদের পর পদ রচনা করিয়া যোজনা করিয়া চলিলেন, কিছুতে যেন থামিতে পারিলেন না,—

আমার নিতিসুখ ফিরে এস, আমার চিরদুখ ফিরে এস,
আমার সব-সুখ-দুখ মন্থন ধন অন্তরে ফিরে এস!

আমার চিরবাঞ্ছিত এস, আমার চিতসঞ্চিত এস,
ওহে চঞ্চল, হে চিরন্তন, ভুজবন্ধনে ফিরে এস!
আমার বক্ষে ফিরিয়া এস, আমার চক্ষে ফিরিয়া এস,
আমার শয়নে স্বপনে বসনে ভূষণে নিখিল ভুবনে এস!
আমার মুখের হাসিতে এস হে
আমার চোখের সলিলে এস,
আমার আদরে আমার ছলনে
আমার অভিমানে ফিরে এস!
আমার সর্ব্বস্মরণে এস আমার সর্ব্বভরমে এস—
আমার ধরম করম সোহাগ সরম জনম মরণে এস!

গাড়ি যখন একটি প্রাচীরবেষ্টিত উদ্যানের মধ্যে প্রবেশ করিয়া একটি দ্বিতল অট্টালিকার সম্মুখে থামিল তখন শশি-ভূষণের গান থামিল।

তিনি কোন প্রশ্ন না করিয়া ভৃত্যের নির্দ্দেশক্রমে বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

যে ঘরে আসিয়া বসিলেন সে ঘরের চারিদিকেই বড় বড় কাঁচের আলমারীতে বিচিত্র বর্ণের বিচিত্র মলাটের সারি সারি বই সাজান। সেই দৃশ্য দেখিবামাত্র তাঁহার পুরাতন জীবন দ্বিতীয়বার কারামুক্ত হইয়া বাহির হইল। এই সোনার জলে অঙ্কিত নানা বর্ণে রঞ্জিত বইগুলি, আনন্দলোকের মধ্যে প্রবেশ করিবার সুপরিচিত রত্নখচিত সিংহদ্বারের মত তাঁহার নিকটে প্রতিভাত হইল।

টেবিলের উপরেও কি কতকগুলি ছিল। শশিভূষণ তাঁহার ক্ষীণদৃষ্টি লইয়া ঝুঁকিয়া পড়িয়া দেখিলেন, একখানি বিদীর্ণ স্লেট, তাহার উপরে গুটিদুয়েক পুরাতন খাতা, একখানি ছিন্নপ্রায় ধারাপাত কথামালা এবং একখানি কাশিরাম দাসের মহাভারত।

স্লেটের কাঠের ফ্রেমের উপর শশিভূষণের হস্তাক্ষরে কালী দিয়া খুব মোটা করিয়া লেখা—গিরিবালা দেবী। খাতা ও বহিগুলির উপরেও ঐ এক হস্তাক্ষরে এক নাম লিখিত।

শশিভূষণ কোথায় আসিয়াছেন বুঝিতে পারিলেন। তাঁহার বক্ষের মধ্যে রক্তস্রোত তরঙ্গিত হইয়া উঠিল। মুক্ত বাতায়ন দিয়া বাহিরে চাহিলেন—সেখানে কি চক্ষে পড়িল? সেই ক্ষুদ্র গরাদে দেওয়া ঘর, সেই অসমতল গ্রাম্যপথ—সেই ডুরে-কাপড়পরা ছোট মেয়েটি—এবং সেই আপনার শান্তিময় নিশ্চিন্ত নিভৃত জীবনযাত্রা।

সেদিনকার সেই সুখের জীবন কিছুই অসামান্য বা অত্যধিক নহে; দিনের পর দিন ক্ষুদ্র কাজে ক্ষুদ্র সুখে অজ্ঞাতসারে কাটিয়া যাইত, এবং তাঁহার নিজের অধ্যয়ন-কার্য্যের মধ্যে একটি বালিকা ছাত্রীর অধ্যাপন-কার্য্য তুচ্ছ ঘটনার মধ্যেই গণ্য ছিল; কিন্তু গ্রামপ্রান্তের সেই নির্জ্জন দিনযাপন, সেই ক্ষুদ্র শান্তি, সেই ক্ষুদ্র সুখ, সেই ক্ষুদ্র বালিকার ক্ষুদ্র মুখখানি, সমস্তই যেন স্বর্গের মত দেশ কালের বহির্ভূত এবং আয়ত্তের অতীতরূপে কেবল আকাঙ্ক্ষারাজ্যের কল্পনাচ্ছায়ায়

মধ্যে বিরাজ করিতে লাগিল। সে দিনকার সেই সমস্ত ছবি এবং স্মৃতি আজিকার এই বর্ষাম্লান প্রভাতের আলোকের সহিত এবং মনের মধ্যে মৃদুগুঞ্জিত সেই কীর্ত্তনের গানের সহিত জড়িত মিশ্রিত হইয়া এক প্রকার সঙ্গীতময় জ্যোতির্ম্ময় অপূর্ব্বরূপ ধারণ করিল। সেই জঙ্গলে বেষ্টিত কর্দ্দমাক্ত সঙ্কীর্ণ গ্রামপথের মধ্যে সেই অনাদৃত ব্যথিত বালিকার অভিমান-মলিন মুখের শেষ স্মৃতিটি যেন বিধাতা-বিরচিত এক অসাধারণ আশ্চর্য্য অপরূপ, অতি গভীর, অতি বেদনা-পরিপূর্ণ স্বর্গীয় চিত্রের মত তাঁহার মানসপটে প্রতিফলিত হইয়া উঠিল। তাহারই সঙ্গে কীর্ত্তনের করুণ সুর বাজিতে লাগিল, এবং মনে হইল যেন সেই পল্লিবালিকার মুখে সমস্ত বিশ্বহৃদয়ের এক অনির্ব্বচনীয় দুঃখ আপনার ছায়া নিক্ষেপ করিয়াছে। শশিভূষণ দুই বাহুর মধ্যে মুখ লুকাইয়া সেই টেবিলের উপর সেই স্লেট বহি খাতার উপর মুখ রাখিয়া অনেক কাল পরে অনেক দিনের স্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন।

অনেক ক্ষণ পরে মৃদু শব্দে সচকিত হইয়া মুখ তুলিয়া দেখিলেন। তাঁহার সম্মুখে রূপার থালায় ফলমূল মিষ্টান্ন রাখিয়া গিরিবালা অদূরে দাঁড়াইয়া নীরবে অপেক্ষা করিতেছিল। তিনি মস্তক তুলিতেই নিরাভরণা শুভ্রবসনা বিধবা-বেশধারিণী গিরিবালা তাঁহাকে নতজানু হইয়া ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিল।

বিধবা উঠিয়া দাঁড়াইয়া যখন শীর্ণমুখ ম্লানবর্ণ ভগ্নশরীর

শশিভূষণের দিকে সকরুণ স্নিগ্ধনেত্রে চাহিয়া দেখিল—তখন তাহার দুই চক্ষু ঝরিয়া দুই কপোল বাহিয়া অশ্রু পড়িতে লাগিল।

শশিভূষণ তাহাকে কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে চেষ্টা করিলেন কিন্তু ভাষা খুঁজিয়া পাইলেন না, নিরুদ্ধ অশ্রুবাষ্প তাঁহার বাক্যপথ সবলে অবরোধ করিল—কথা এবং অশ্রু উভয়েই নিরুপায় ভাবে হৃদয়ের মুখে কণ্ঠের দ্বারে বদ্ধ হইয়া রহিল। সেই কীর্ত্তনের দল ভিক্ষা সংগ্রহ করিতে করিতে অট্টালিকার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল এবং পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করিয়া গাহিতে লাগিল—

এস এস হে!

সমাপ্ত।

☞ সাহিত্য-যন্ত্র ; ১৩/৭ বৃন্দাবন বসুর লেন ; হোগলকুঁড়িয়া, কলিকাতা।